কঞ্জুস

সুমন্ত আসলাম

SUPERIOR SUNY

BOILOVERS.COM

ভীষণ অবাক হয়ে মফিজ সাহেব তার ছেলের প্রেমিকা মিতুকে বলেন, 'আম্মাজান, ভাত খেয়ে তুমি হাত ধুচ্ছো কেন! হাতের সঙ্গে অনেক তেল লেগে আছে, তেলগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে না ফেলে মাথার চুলে মাখো। এতে মাথায় তেলও দেয়া হবে, আর সাবানের ক্ষারে হাতও নষ্ট হবে না তোমার।'

দাঁত ক্ষয় হয়ে যাবে, সে জন্য না, দাঁত পরিষ্কার করতে হলে ব্রাশ আর টুথপেস্ট কিনতে হবে, দাঁত ব্রাশও করেন না মফিজ সাহেব।

খুব কৃপণ একজন মানুষ মফিজ সাহেব। এতদিন তিনি ভালোই ছিলেন, হঠাৎ একটা মুশকিলে পড়েছেন তিনি—তার একমাত্র ছেলে বিয়ে করতে চায়। অবশ্য কথাটা সে মুখে বলে না, আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়—তার একজন বউ দরকার। কিন্তু ছেলেকে তিনি বিয়ে করাবেন না। কারণ বিয়ে করাতে হলে অনেক টাকা খরচ হবে, বউকে তিনবেলা খেতে দিতে হবে, আরো অনেক কিছু। ছেলে কিন্তু বিয়ে করবেই—সে-ও শুরু দেয় অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু কান্ড।

মাঝরাতে হঠাৎ একদিন মফিজ সাহেবের ঘরে একজন মানুষ আসে। তারপর থেকেই কেমন যেন হয়ে যান তিনি। বাড়িতে চোর ঢোকে, কিছুদিন পর পর চুরি হয় তার বাড়িতে।

তারপর একদিন...।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

কঞ্জুস

সুমন্ত আসলাম

পার্ল পাবলিকেশন্স

৮৯১.৪৪৭

পঞ্চম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৫
চতুর্থ মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০০৪
তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০০৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০০৪
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৪

©
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ISBN–984-495-101-2

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে হাসান জায়েদী কর্তৃক প্রকাশিত
এবং সালমানী মুদ্রণ নয়াবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষরবিন্যাস দীপ্তি কম্পিউটারস ৩৮/২খ বাংলাবাজার ঢাকা।

মূল্য : ৬৫ টাকা

বিকেল হলেই আমরা একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা অফিসের গলিতে আড্ডা দিতাম। কখনো মাইলের পর মাইল হাঁটতাম কথা বলতে বলতে, কখনো মগ্ন থাকতাম নাটক, গল্প, উপন্যাস নিয়ে। চলমান রাজনীতি ছাড়াও বিগত অনেক বিষয়ে সে এত বেশি জানত, অনেক সময় মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম তার দিকে। মাথা ন্যাড়া তার, কিন্তু সে মাথা থেকেই বের হতো মুগ্ধ করা গদ্য, বিমোহিত করা কবিতা।

আহসান কবির, প্রিয় কবির ভাই

আপনি আমাকে আদর করে একটা নাম ধরে ডাকতেন, কত দিন সে ডাক শুনি না! মাঝে মাঝে মনে হয়, এই বুঝি এলেন, এই বুঝি সেই কথাটা বললেন, 'পাগলা দেখিস, একদিন তুই অনেক বড় হবি!'

আমি বিড়বিড় করে আওড়াই— আমার চেয়ে যোগ্য কেউ নেই, আমিই সেরা। আমাকে পারতে হবে, আমিই পারব, আমি না পারলে কেউ পারবে না।

এমন আমাকে করতে হয়, কারণ আমি দেখেছি— মাঠে নেমে অন্য কাউকে যদি নিজের চেয়ে যোগ্য মনে হয়, পরাজয় সেখানেই নিশ্চিত হয়ে যায়।

—ভেনাস উইলিয়ামস

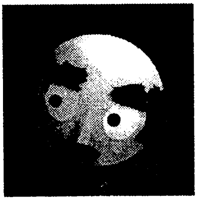

খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন মফিজ সাহেব। তার দু'হাত দু'দিকে এমনভাবে মেলে দেওয়া যেন আকাশে উড়ছেন তিনি; আর মুখটা এমনভাবে হাঁ করা যেন সামনে যা পাবেন তা-ই গিলে খাবেন গপাত করে। হাঁ করা সেই মুখ দিয়ে বিশ্রী একটা শব্দ বের হচ্ছে, মনে হচ্ছে খেতে খেতে কোনো কিছু গলায় আটকে যাচ্ছে তার, তিনি তা বের করার চেষ্টা করছেন। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তিনি কথা বলছেন, ফিসফিস করে কাকে যেন কী বলছেন, মুচকি মুচকি হাসছেন, আবার খিলখিল করে হেসেও উঠছেন মাঝে মাঝে।

গলা থেকে বুক পর্যন্ত খাটো একটা ফতুয়ার মতো জামা পরে আছেন মফিজ সাহেব। এর নিচ থেকে পেট পর্যন্ত খালি তার। তিনি খিলখিল করে হেসে ওঠেন আর খলখল করে নড়ে ওঠে তার পেটটা। মাঝে মাঝে কাত হয়ে পাশে শুয়ে থাকা স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে দেন ঘুমের মাঝেই। বিরক্তমুখে হাতটা ছিটকে সরিয়ে দেন তার স্ত্রী। মফিজ সাহেব তখন অন্য কাতে ফিরে পাশে রাখা কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরেন। তিনি আবার কথা বলেন, হাসেন, কোলবালিশটা আরো জোরে জাপটে ধরেন।

পুরো চেহারাটা কাপড়ে ঢেকে শুধু চোখ দুটো বের করে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে মফিজ সাহেবের সামনে। আলখেল্লার মতো একটা জামা পরে মানুষটা এতক্ষণ মফিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এসব দেখছিল। মাঝরাত, চারদিকে অন্ধকার, কিন্তু বারান্দায় জ্বালিয়ে রাখা লাইটের আলোয় বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা।

মফিজ সাহেব কোলবালিশটা ছেড়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুলেন আবার। মুখঢাকা মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছিয়ে এলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল মফিজ সাহেবকে। না, মফিজ সাহেব ঘুমিয়েই আছেন, আপাতত ঘুম ভাঙার কোনো সম্ভবনা নেই তার।

মানুষটা আবার একটু এগিয়ে এলো মফিজ সাহেবের দিকে। একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়াল সে, মফিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল সরাসরি, আবার নিশ্চিত হয়ে একটু এগিয়ে গেল সামনের দিকে। আগের মতোই হাঁ করে ঘুমাচ্ছেন মফিজ সাহেব। মুখঢাকা মানুষটা একটু উপুড় হয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল মফিজ সাহেবের দিকে, তার মুখের সামনে হাত নিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করল, না, সত্যি সত্যি গভীরভাবে ঘুমাচ্ছেন মফিজ সাহেব।

আরো একটু উপুড় হয়ে মফিজ সাহেবের মুখের ঠিক সামনে চোখ নিয়ে ভালোভাবে দেখতে লাগল মানুষটা, সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বিকট একটা শব্দ করলেন মফিজ সাহেব। চমকে উঠে একটু পিছিয়ে এসে কিছুক্ষণ পর মানুষটা আবার এগিয়ে গেল মফিজ সাহেবের দিকে, সরাসরি তাকাল তার মুখের ভেতর। হাঁ করা মুখ দিয়ে গরগর করে নিঃশ্বাস ছাড়ছেন তিনি, আলজিহ্বাটি অল্প অল্প নড়ছে তার, একটু একটু কাঁপছেও সেটা। মানুষটার ভীষণ ইচ্ছে হলো আলজিহ্বাটি একটু ছুঁয়ে দেখতে। জীবনে অনেক কিছু স্পর্শ করেছে সে, কিন্তু অন্য মানুষের আলজিহ্বা কখনো ছুঁয়ে দেখার সুযোগ হয়নি।

মানুষটা তার হাতের একটি আঙুল সোজা করে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিল মফিজ সাহেবের দিকে, আস্তে আস্তে সেটা ঢুকিয়ে দিল তার মুখের ভেতর। একটু একটু করে আঙুলটা এগিয়ে যাচ্ছে, একটু একটু করে মানুষটা কাঁপছে, মানুষটার আঙুলও কাঁপছে। আঙুলটা এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে, আর একটু, আর একটু, ঠিক তখনই শব্দ করে কেশে উঠলেন মফিজ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেল লোকটার মুখ, না কাশির শব্দ শুনে নয়, সময়মতো আঙুলটা সরিয়ে না আনলে মফিজ সাহেবের দাঁতে চাপা পড়ে আঙুলের যে কী অবস্থা হতো, সেটা ভাবতেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল মানুষটা।

আবার হাঁ করেছেন মফিজ সাহেব। এবার আর সাহস হলো না মানুষটার। আলজিহ্বাটা দেখার জন্য শুধু উপুড় হলো সে। সঙ্গে সঙ্গে মফিজ সাহেব বললেন, 'কী দেখ?'

কলজের ভেতর ধক্ করে গুঁতো লাগল মানুষটার। চোখ দুটো বড় বড় করে সে তাকিয়ে রইল মফিজ সাহেবের দিকে। মফিজ সাহেব মুচকি হাসলেন, 'কী, কথা বলিতেছ না কেন?'

ঝট করে মানুষটা পেছন ফিরে তাকাল। না, পেছনে কেউ নেই। ডান পাশে তাকাল, না, কেউ নেই। বাঁ পাশে তাকাল, না, সেখানেও কেউ নেই। চোখ দুটো আরো বড় হয়ে গেল মানুষটার। বুকের ভেতর শব্দ হতে লাগল জোরে জোরে, মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠল তার।

'কী, ভয় পাইয়াছ?' মফিজ সাহেব হাসতে লাগলেন শব্দ করে। মানুষটা ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসতে লাগল পা টিপে টিপে। একটু পিছিয়ে এসে সে ভালোভাবে মফিজ সাহেবের দিকে তাকাল। মফিজ সাহেব কী যেন বললেন, সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলল মানুষটা। না, ভয়ের কিছু নেই, ঘুমিয়ে আছেন মফিজ সাহেব, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছেন তিনি।

নিজের বুকে নিজেই একটু থুথু ছেটাল মানুষটা। ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখটি স্বাভাবিক হয়ে এলো তার, সে আবার একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাল একবার। এ ঘরের খোলা দরজার পাশ থেকে কে যেন ঝট করে সরে গেল। একটু চমকে উঠল মানুষটা। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ দরজার দিকে। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না এখন। মানুষটা মুচকি হাসল, উত্তেজনায় চোখে ভুল দেখেছে

সে। দরজার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে আবার এগিয়ে যেতে লাগল মফিজ সাহেবের দিকে, একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে তাকাল দরজার দিকে। সত্যি সত্যি দরজার কাছে কেউ নেই।

মানুষটা দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল, তারপর আবার এগিয়ে যেতে লাগল মফিজ সাহেবের দিকে। তার ঠিক কাছাকাছি গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আশপাশে একবার চোখ ফিরিয়ে বেশ আদুরে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মফিজ সাহেবের দিকে। মুখটা আগের মতোই হাঁ করা, আলগা পেটটা একবার উঠছে একবার নামছে, মাঝে মাঝে কথা বলছেন, মুচকি হাসছেন। আলতো করে মফিজ সাহেবের পেটে একটা খোঁচা দিল মানুষটা।

মোচড় দিয়ে উঠলেন মফিজ সাহেব।

মানুষটা একটু পিছিয়ে এলো, একটু থেমে কিছুক্ষণ পর আবার এগিয়ে গেল। আবার খোঁচা দিল মফিজ সাহেবের পেটে। আবার মোচড় দিয়ে উঠলেন মফিজ সাহেব। একটু পর পাশ-ফিরে শুয়ে কোলবালিশটা জাপটে ধরে ঘুমাতে লাগলেন আরাম করে।

মানুষটা একটু ঝুঁকে এসে মফিজ সাহেবের পেটটা ভালোভাবে দেখে নিল, তারপর পর্যায়ক্রমে খোঁচাতে লাগল তার পেটটা।

মফিজ সাহেব আবার চিৎ হয়ে শুলেন এবং খিলখিল করে হাসতে লাগলেন একনাগাড়ে। মফিজ সাহেব হাসছেন, লোকটা খোঁচাচ্ছে। হাসতে হাসতে হঠাৎ খাট থেকে ঠাস করে নিচে পড়ে যান মফিজ সাহেব। উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ সেভাবেই শুয়ে থাকেন তিনি। একটু পর মেঝের ওপর শুয়ে থেকেই কী যেন খুঁজতে থাকেন হাত দিয়ে। এদিক-ওদিক হাতড়ে কোনো কিছু খুঁজে না পেয়ে পিটপিট করে একবার তাকিয়ে আবার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেন। হাত দুটো আরো দু'দিকে প্রসারিত করে হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি বলেন, 'আমার কোলবালিশ কোথায়?'

'খাটের ওপর।' মানুষটা একটু পিছিয়ে আসে।

'আমিও তো খাটের ওপর।'

'না, তুমি এখন খাটের নিচে।'

'যা, খালি মিথ্যা কথা বলে।'

'মিথ্যা কথা না, তুমি এখন সত্যি সত্যি খাটের নিচে।'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠেন মফিজ সাহেব। দ্রুত মেঝে থেকে উঠতে গিয়েই খাটের সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো খান মাথায়। 'উহ্' শব্দ করেই মুখটা বাঁকা করে বলেন, 'মরিয়াছি রে, মরিয়া গিয়াছি।'

মানুষটা আরো একটু পিছিয়ে এসে বলে, 'মৃত মানুষ কখনো কথা বলতে পারে না।'

'তাহা হইলে আমি বাঁচিয়া আছি?'

'হ্যাঁ, তুমি বেঁচে আছ।'

মাথা হাতাতে হাতাতে মেঝের ওপর ঠিকমতো বসে সামনের দিকে তাকান মফিজ সাহেব। একটু পর চোখ দুটো মেলে আরো ভালো করে তাকান সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড রকম চমকে ওঠেন। তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে বলেন, 'অ্যা, অ্যা, আমি এইখানে কেন?'

'তুমি হাসতে হাসতে একা একাই এখানে পড়ে গেছ।'

'কখন?'

'একটু আগে।'

ঘুমে বুজে আসা চোখ দুটো কিছুটা জোর করে খুলে চারপাশটা একবার দেখে নিলেন মফিজ সাহেব। তারপর নিজের অবস্থান দেখে হতাশ স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো। তা আমার কোলবালিশ কোথায়?' একটু থেমে, দু'হাত দিয়ে দু'চোখ ডলে পিটপিট করে তাকিয়ে আবার বলেন, 'তা বাবা, তুমি কে?'

'আমি আসমান থেকে এসেছি।'

'কী!' ভীষণ ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসলেন মফিজ সাহেব। হাঁটু দুটো মুড়ে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে কিছুটা কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, 'কেন বাবা, তুমি কি আমার ধন-সম্পদ লুট করিতে আসিয়াছ? না বাবা...।' মুখঢাকা মানুষটার পায়ের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে মফিজ সাহেব কান্না-স্বরে বললেন, 'তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে আসমানে নিয়া বান্ধিয়া রাখিও, সমুদ্রের মধ্যে চুবাইয়া চুবাইয়া মারিও, তবুও তুমি আমার কিছু নিও না বাবা। আমি তাহা হইলে মরিয়া যাইব, একেবারে না খাইয়া মরিয়া যাইব।'

'তোমাকে যদি আসমানে নিয়েই যাই, তাহলে তোমার ধন-সম্পদ দেখবে কে, কে খাবে এসব?'

মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অসহায় ভঙ্গিতে মফিজ সাহেব বললেন, 'তাও তো কথা, সত্যি কথা।'

মুখঢাকা মানুষটা হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে কেউ একজন তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে মানুষটা। এ মুহূর্তে কী করবে ঠিক ভেবে পাচ্ছে না সে। ঘাড়ের কাছটা শিরশির করছে তার, কেমন যেন করছে শরীরটা। পেটের ভেতর গুড়গুড় করে শব্দ করছে। হঠাৎ সে ঝট করে পেছন দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। যা ভেবেছিল তা-ই, ঘোমটা-পরা একটা মানুষ তার চেয়েও দ্রুতগতিতে সরে গেল দরজার পাশ থেকে। কিন্তু একটা জিনিস সে বুঝতে পারল, ঘোমটা-পরা মানুষটা ছিল একজন মহিলা, অন্তত আলো-আঁধারি এই পরিবেশে তার চলে যাওয়ার ভঙ্গিমা দেখে তা-ই মনে হয়েছে তার।

কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেল মানুষটা, এত রাতে তার পেছনে কে আসতে পারে, কাউকে তো সে কিছু বলেনি, তার পরিকল্পনার কথা জানায়নি, তাহলে? ভুল দেখল না তো, নাকি মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত ব্যাপারটাই চোখে ভেসে উঠেছে! কিছু ভেবে পাচ্ছে না সে।

ঘুরে দাঁড়াল মুখঢাকা মানুষটা। একটু চিন্তা করে মফিজ সাহেবকে বলল, 'আমি কিন্তু ধন-সম্পদ নিতে আসিনি।'

'তাহা হইলে?'

'একটা বিয়ের ব্যাপারে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে মফিজ সাহেব শিরদাঁড়া সোজা করে বসেন এবং বেশ লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বলেন, 'সত্যি? বাবা, আমি তো আরেকটা করিতেই চাই, কিন্তু তোমার চাচী তো রাজি হয় না।'

'এই বয়সেও?'

'বয়স হইয়াছে তো কী হইয়াছে।' হাত দুটো কাচুমাচু করে লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে মফিজ সাহেব বললেন, 'একটা সাধ জাগিয়াছে মনে, তাই।'

'আমি তো তোমার বিয়ের কথা বলছি না।'

ভীষণ চমকে ওঠেন মফিজ সাহেব। উত্তেজিত হয়ে কিছুটা তোতলাতে তোতলাতে বলেন, 'তা...হা হ...ইলে কা...হার?'

'তোমার একমাত্র ছেলের।'

'আরে দূর, ওর বিবাহের বয়স হইয়াছে নাকি!'

'অবশ্যই হয়েছে।' মুখঢাকা মানুষটা কেমন যেন সজাগ হয়ে যায়, তার মনে হচ্ছে পেছনে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এবার আর পেছনে তাকাতে ইচ্ছে হয় না তার।

'না না হয় নাই, একদম বয়স হয় নাই। তাহা ছাড়া চাকরি নাই বাকরি নাই, বউকে খাওয়াইবে কী? হাওয়া, না পানি?' প্রচণ্ড উত্তেজনায় মফিজ সাহেব উঠে দাঁড়ান।

'তোমরা যা খাবে, বউও তা খাবে?'

'বউ পালা আর হাতি পালা সমান কথা।'

'কথাটা ঠিক না।'

'আমি বিবাহ করিয়াছি, আমি জানি না!'

'তবুও তো তুমি আরেকটা বিয়ে করতে চাইছ।'

পাশে শুয়ে থাকা মফিজ সাহেবের স্ত্রী ছালেহা বেগম হঠাৎ নড়েচড়ে ওঠেন, সামান্য ক্ষণের জন্য একবার চোখ খুলে আবার পাশ-ফিরে শোন। তা দেখে মফিজ সাহেব ভীষণ ভয় ভয় গলায় বলেন, 'কই চাহিলাম, খালি মিথ্যা কথা।' আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখেন ঘুমিয়ে পড়েছেন ছালেহা বেগম। তবুও তিনি তার মুখের সামনে হাত নিয়ে নড়াচড়া করে নিচু হয়ে বলেন, 'বাবা, আমিই মিথ্যা কথা বলিয়াছি, তা পাত্রী-টাত্রী আছে নাকি?'

'আপনি যে আরেকটা বিয়ে করতে চান, তা আপনার স্ত্রী জানে তো?'

'ওর জানিবার দরকার কী?'

'দরকার নেই?'

‘আমার খাইবে, আমার পরিবে, ওকে জানাইয়া কী লাভ?’

‘তবুও।’

মফিজ সাহেব হঠাৎ থমকে যান। গভীর চোখে মুখঢাকা মানুষটাকে দেখতে থাকেন এবং এগিয়ে আসতে থাকেন তার দিকে। একেবারে সামনে আসার আগেই মুখঢাকা মানুষটা হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দেন মফিজ সাহেবকে। মফিজ সাহেব মানুষটার ঠিক মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়ে বেশ চিন্তাযুক্ত মুখে বলেন, ‘তোমার গলাটা যেন কেমন চেনা চেনা লাগিতেছে বাবা!’

‘কার মতো লাগছে?’

কথাটা বলেই মুখঢাকা মানুষ চমকে যায়। পেছনে একটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরের আলোতে পেছনের মানুষটার ছায়া দেখা যাচ্ছে সামনে। মানুষটার হাতে একটা লাঠির মতো কী যেন, ছায়ায় ওটাও দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মুখঢাকা মানুষটা ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে পেছনের লাঠিটি ওপরে উঠছে, আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। ঝট করে সেটা নিচে আসতে লাগল নিমেষেই। কিন্তু তার আগেই মুখঢাকা মানুষটা দ্রুত সরে গেল বাঁ পাশে। লাঠিটা সরাসরি আঘাত হানল মফিজ সাহেবের মাথায়। সামান্য শব্দ করে সঙ্গে সঙ্গে মফিজ সাহেব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে, মেয়েলি একটি চিৎকার দিয়ে লাঠি-ধরা মানুষটিও পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েমানুষের গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকে উঠল মুখঢাকা মানুষটা। তার ইচ্ছে হলো মেয়েটাকে চিনে নেওয়ার, কিন্তু আপাতত সাহস হলো না। দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে পা ফেলে মানুষটা বের হয়ে এলো ঘর থেকে।

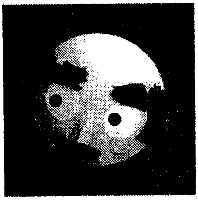

মুখের ভেতর থেকে পিক করে পানিগুলো ফেলে দিয়েই সেলিম বলল, 'আম্মাজান, কেমন আছেন?'

চোখ দুটো বড় বড় করে তাকালেন ছালেহা বেগম। ভীষণ রাগ হচ্ছে তার। কখন থেকে রান্নাঘরের হেঁশেলের সামনে বসে আছে সেলিম। হেঁশেলের ওপর একটা পাত্রে পানি গরম হচ্ছে, একটু পরপর সেখান থেকে গ্লাসে পানি ঢালছে সে, তারপর তাতে এক চিমটি লবণ আর এক ফোঁটা মধু মিশিয়ে গরগরা করছে ওই পানি দিয়ে। একবার করে গরগরা শেষ হয়, কুলি করে সে পানি ফেলে দিয়ে মায়ের দিকে তাকায়, তারপর মেয়েদের মতো গলার স্বর করে বলে, 'আম্মাজান, কেমন আছেন।'

সকাল থেকে এই একটা কাজই করছে সেলিম। এদিকে রান্নার সময় চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার এক কথা, সে যা করতে চাইছে তা হেঁশেলের ফুটন্ত পানি ছাড়া অসম্ভব। সুতরাং আপাতত সে হেঁশেলের সামনে থেকে উঠতে পারছে না। হেঁশেলে পানি ফুটবে, সে পানি গ্লাসে ঢালবে, তাতে লবণ-মধু মেশাবে, তারপর ওই পানি মুখের ভেতর নিয়ে গরগরা করবে। আপাতত তার কাজ এটাই।

আরেকবার গরগরা শেষ করে সেলিম যখন বলতে যাবে 'আম্মাজান, কেমন আছেন', ঠিক তখনই তরকারি কাটা বাদ দিয়ে সেলিমের দিকে হাত উঁচু করে ছালেহা বেগম বললেন, 'আরেকবার ও কথা বলছিস তো এক থাপ্পড় দিয়ে তোর বত্রিশটা দাঁত তুলে ফেলব।'

সেলিম হাসতে হাসতে বলল, 'বত্রিশটা দাঁত তুমি কোথায় পাবে মা?'

'কেন?'

'সেদিন আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে গুনে গুনে দেখলাম, আমার দাঁত আছে একত্রিশটা। একটা আক্কেল দাঁত এখনো ওঠে নাই।'

'সে জন্যই বেআক্কেল আছিস এখনো।'

'তাই নাকি!' কিছুটা আশ্চর্য হওয়ার ভান করে সেলিম বলল, 'আব্বার নাকি এই বয়সেও দুটো আক্কেল দাঁত ওঠে নাই। আব্বা কি তাহলে মহা বেআক্কেল মা?'

'চুপ কর।' ছালেহা বেগম কপাল কুঁচকে একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা, তোর কী হয়েছে বল তো!'

'কই, কিছু তো হয় নাই।'

'তাহলে এমন করছিস কেন?'

'কেমন করছি!'

'কেমন করছিস, জানিস না?'

'তুমি রাগ করছ কেন মা?'

'রাগ করব না? সেই কখন খেকে পানি নিয়ে গরগরা করছিস আর একটু পরপর বলছিস 'আম্মাজান, কেমন আছেন'। গলাব্যথা হলে, টনসিল ফুলে গেলে, মানুষ গরম পানিতে লবণ দিয়ে কুলকুচা করে গলার ব্যথা কমায়। আর তুই কুলকুচা করে বলছিস 'আম্মাজান, কেমন আছেন; আম্মাজান, কেমন আছেন'। তাও স্বাভাবিকভাবে বললে হতো, বলছিস মেয়েদের মতো করে। আচ্ছা, এ রকম মেয়েলি করে বলার কারণ কী, বল তো?'

'কারণ নিশ্চয় একটা আছে মা।'

'আচ্ছা কারণ আছে, কিন্তু গরম পানিতে লবণ-মধু মিশিয়ে গরগরা করছিস কেন, সেটা আগে বল।'

'বলতে পার এটা একটা চিকিৎসা।'

'কিসের চিকিৎসা?'

'মেয়েদের মতো গলা বানানোর চিকিৎসা।'

'এই চিকিৎসা তুই কোথায় পেলি?'

'আমি নিজে নিজেই আবিষ্কার করেছি মা।'

'তুই আবিষ্কার করেছিস!'

'অবাক হলে মনে হয়?' সেলিম মায়ের দিকে বিশেষ ভঙ্গিমায় তাকিয়ে বলল, 'নিউটন যদি কম্পিউটার আবিষ্কার করতে পারে, আইনস্টাইন যদি প্লেন আবিষ্কার করতে পারে, তাহলে আমি কেন কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারব না!'

'নিউটন কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে, আইনস্টাইন প্লেন আবিষ্কার করেছে, এ কথা তোকে কে বলল?'

'ওই হলো মা, তারা আবিষ্কার না করলে অন্য কেউ করেছে।'

'এই জন্যই এমএ পাস করেও তোর কোনো চাকরি হচ্ছে না।'

'হবে মা হবে।'

'কবে?'

'যেদিন হবে।'

ছালেহা বেগম উঠে দাঁড়িয়ে সেলিমের দিকে এগিয়ে এসে রাগী গলায় বলেন, 'তুই এখন যা, আর এক মিনিট দেরি করলে এই গরম পানি তোর মাথায় ঢেলে দেব।'

'গরম পানি মাথায় ঢাললে কি চিকিৎসাটা ভালো হবে মা?'

'গেলি?'

'আচ্ছা যাচ্ছি। তার আগে আর একবার গরগরা করি, এইবারই শেষ।'

গ্লাসে আবার পানি ঢালল সেলিম, লবণ-মধু মেশাল এবং মুখের ভেতর পানি নিয়ে গরগরা করতে লাগল। অনেকক্ষণ গরগরা করে পানিটুকু মুখ থেকে ফেলে দিয়ে শেষে মায়ের দিকে চোখ দুটো বড় বড় করে আগের মতোই মেয়েলি গলায় বলল, 'আম্মাজান, কেমন আছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ছালেহা বেগম পাশে রাখা একটা চামচ দিয়ে সেলিমকে মারতে নিতেই সেলিম ফিরে দৌড়ে চলে গেল তার ঘরে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ছালেহা বেগম পাশ-ফিরে তাকালেন। কাজের মেয়ে চম্পা মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে পেঁয়াজ কাটছে। তিনি রাগী রাগী গলায় বললেন, 'এই, তোর আবার কী হলো?'

'কই, কিছু হয় নাই।'

'কিছু হয় নাই তো মুখটা পেঁচার মতো করে রেখেছিস কেন?'

'আমার চেহারা তো পেঁচার মতোই।'

'তোর চেহারা পেঁচার মতো এ কথা কে বলেছে?'

'ছোট আপা তো আমাকে প্রতিদিন পেঁচা কইয়াই ডাকে।'

'প্রমা তোকে পেঁচা বলে ডাকে আর তুই পেঁচা হয়ে গেলি, না?'

'আম্মা, আমার মনটা আসলেই খারাপ।'

'আমি তো সে কথাই বলছি, বল, কী হয়েছে?'

'আম্মা...।' চম্পা ছালেহা বেগমের দিকে তাকিয়ে মাথাটা আর নিচু করে ফেলে।

'থামলি কেন, বল।'

'আম্মা, আমার কেমন যেন ভয় করতাছে।'

'ভয়ের কিছু নাই, বল।'

'আমার সত্যি সত্যি ভয় করতাছে।'

'তুই কি ভয়ের কিছু করেছিস?'

'হ আম্মা।'

চোখ দুটো বড় বড় করে ছালেহা বেগম বললেন, 'বল, কী করেছিস?'

'মাথায় বাড়ি দিছি একজনরে?'

'কার?' ভীষণ চমকে ওঠেন ছালেহা বেগম।

'আম্মা, তার আগে কন, যদি লোকটা মইরা যায়, তাইলে কি আমার জেল-ফাঁসি অইব?'

'অবশ্যই।'

'কন কি আম্মা!'

'ঠিকই বলেছি।' ছালেহা বেগম একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা, তোর আঘাতে মানুষটার মাথা কি ফেটে গেছে?'

'জানি না আম্মা।'

'রক্ত বের হয়েছিল?'

'তাও জানি না আম্মা।'

'মানুষটা কি চিৎকার দিয়ে উঠেছিল?'

'একটু চিৎকার দিয়া অজ্ঞান অইয়া গেছিল।'

'বলিস কি! তারপর?'

'তারপর আমি আর কিছু জানি না আম্মা।'

'জানিস না মানে?'

'আমিও অজ্ঞান অইয়া গেছিলাম।'

'তাই নাকি, তা কার মাথায় বাড়ি মেরেছিলি, বল তো?

চম্পা মুখ তুলে তাকায় ছালেহা বেগমের দিকে। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ রান্নাঘরের দরজা দিয়ে চোখ যায় বাইরে। মফিজ সাহেব মাথায় হাত দিয়ে পায়চারি করছেন বারান্দায়, মুখটা বিকৃত করে ফেলছেন ব্যথায়, মাঝে মাঝে কান্নার মতো করে ফেলছেন চেহারাটা।

'কিরে, কথা বলছিস না কেন!'

ভীষণ চমকে উঠে বাইরে থেকে ছালেহা বেগমের দিকে চোখ ফেরায় চম্পা। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আমার বুক কাঁপতাছে আম্মা, পা কাঁপতাছে। আমি কিছু কইবার পারুম না, আপনে আমারে ধরেন আম্মা।'

চম্পা হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে ঢুলতে ঢুলতে পড়ে যায় মেঝের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠেন ছালেহা বেগম। চিৎকার শুনে মফিজ সাহেব দৌড়ে আসেন। মুখের ভঙ্গি ব্যথা ব্যথা করে কিছুটা রাগস্বরে বলেন, 'কী হইয়াছে, আগুন লাগিয়াছে, না ডাকাত পড়িয়াছে!'

ছালেহা বেগম তার চেয়েও বেশি রেগে গিয়ে বলেন, 'ও দুটোর কিছুই হয় নাই, চম্পা অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'কেন?'

'ও যেন কার মাথায় বাড়ি দিয়েছে?'

'বলো কি! কখন?'

'তা বলে নাই।'

'কাহাকে দিয়াছে, তাহা বলিয়াছে?'

'না।'

'না বলুক।' মফিজ সাহেব একটু এগিয়ে এসে ছালেহা বেগমকে বলেন, 'সেলিমের মা, ও কার মাথায় বাড়ি দিয়াছে তাহার নাম না বলুক, তুমি আমাকে একটা লাঠি দাও, আমি ওর মাথায় একটা বাড়ি দিব।'

'আপনি কেন ওর মাথায় বাড়ি দেবেন!'

'কারণ আছে।' মফিজ সাহেব মাথায় হাত দিয়ে ব্যথায় কোঁকাতে কোঁকাতে বলেন, 'কারণ আছে সেলিমের মা, ভয়ঙ্কর কারণ।'

'ভয়ঙ্কর কারণ! সেটা আবার কী?'

'এটা বলিতে পারিব না সেলিমের মা, আমার লজ্জা লাগিতেছে।' মফিজ সাহেব কান্না কান্না মুখ করে দৌড়ে চলে যান বারান্দার দিকে।

টেলিফোনের তালায় একটা লোহার তার দিয়ে খোঁচাচ্ছে সেলিম। মফিজ সাহেব সব সময় টেলিফোনে তালা দিয়ে রাখেন, কারণ একবার প্রায় ৭০০ টাকার মতো বিল এসেছিল

টেলিফোনে। বিলটা দেখেই মফিজ সাহেবের জ্ঞান হারানোর দশা হয়েছিল। পরে তিনি চার দিন কোনো বাজার করেননি। বাজারের টাকা বাঁচিয়ে টেলিফোনের বিল দিয়েছিলেন।

সেলিম তালার ভেতর লোহার তার দিয়ে খোঁচাচ্ছে আর উঁকিঝুঁকি মেরে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আছে মফিজ সাহেব এসে পড়েন কি না! তালাটা তাকে খুলতেই হবে। চাবি অনেক খুঁজেও না পেয়ে এই ব্যবস্থায় হাত দিয়েছে সে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হঠাৎ তালাটা খুলে ফেলল সে। দ্রুত টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে গিয়েই থেমে গেল। পাশে রাখা গ্লাস থেকে গরমপানি মুখে নিয়ে গরগরা করে পানিটুকু কোথাও ফেলার জায়গা না পেয়ে গিলে ফেলল। তারপর অদ্ভুতভাবে মেয়েলি গলায় একা একাই বলল, 'কেমন আছ গোলাপফুল?' নিজের গলার স্বরে সন্তুষ্ট হয়ে সে খুশি খুশি মুখে ডায়াল করতে লাগল টেলিফোনে। রিং বেজে উঠতেই কেশে নিল গলাটা, তারপর রিসিভারটা ওপাশ থেকে তুলতেই সে আগের মতোই মেয়েলি গলায় বলল, 'কে বলছেন?'

ওপাশ থেকে বলল, 'আমি মিতুর বাবা।'

'অ আংকেল, কেমন আছেন আপনি?'

'ভালো, কে বলছ তুমি?'

'আমার নাম র-ত-না।'

'কে?'

'র-ত-না।' সেলিম আগের মতোই টেনে টেনে বলল, 'আংকেল, আমি মিতুর বান্ধবী।'

'তোমার গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন?'

'ভীষণ ঠাণ্ডা লেগেছে আংকেল।'

'অ।'

'আচ্ছা আংকেল, মিতুকে নাকি বিয়ে দিচ্ছেন?'

'দিতে আর পারছি কই মা। তুমি তো ওর বান্ধবী, কথাটা বোধহয় তুমি জানো, তবু তোমাকে বলি, ও বিয়ে করতে চাইছে না।'

সেলিম কিছুটা উদ্বিগ্ন হওয়ায় ভান করে গলাটা আরো তীক্ষ্ণ করে বলল, 'কেন কেন?'

'কী বলব মা, ও তো রাজি হচ্ছে না।'

'তাই নাকি! কেন?'

মিতুর বাবা রাগতে রাগতে বললেন, 'কী একটা উড়নচণ্ডী ছেলের পাল্লায় পড়েছে, তাকেই নাকি বিয়ে করবে ও। ছেলেটাকে হাতের কাছে পেলে হয়, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব।'

'উহ্!'

'কী হলো কী হলো, ব্যথা পেলে নাকি তুমি?'

'না আংকেল, এমনি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মিতুর বাবা বলেন, 'মিতু যখন মা হবে, তুমি যখন মা হবে...।'

কথাটা শেষ করার আগেই সেলিম বলল, 'আমি যখন বাবা হব...।'

‘কী বললে?’ মিতুর বাবা কিছুটা চিৎকার করে ওঠেন।

‘না আংকেল ঠিক আছে। কী যেন বলছিলেন, মিতু যখন মা হবে...।’ সেলিম গলাটা মেয়েদের মতো আরো চিকন করে ফেলল।

‘হ্যাঁ, তখন ও বুঝবে ছেলে-মেয়ে বড় হলে বাবা-মার কত দায়িত্ব।’

‘আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি আংকেল।’ সেলিম একটু থেমে বলল, ‘তা আংকেল, মিতু কি বাসায় আছে? ওকে একটু দেবেন?’

‘ধরো। ও ওর ঘরে আছে, ডেকে দিচ্ছি।’

মিতুর বাবা রিসিভারটা রেখে মিতুকে ডাকতে যেতেই সেলিম পাশে রাখা গ্লাস থেকে একটু পানি খেয়ে নেয়। বুকটা দুর দুর করছে তার। গলাটা কেশে নিয়ে সে রিসিভারটা ঠেসে ধরে কানের কাছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেতেই সে একটু সোজা হয়ে বসে, তারপর আগের মতো মেয়েলি গলায় বলে, ‘কে?’

মিতু ওপাশ থেকে বলে, ‘আমি মিতু।’

‘কে?’

ভীষণ রেগে গিয়ে কিন্তু ফিসফিসিয়ে মিতু বলে, ‘এভাবে কথা বলছ কেন?’

‘কীভাবে বলছি?’

‘মেয়েদের মতো গলা করছ কেন তুমি?’

সেলিম গলাটা আরো মেয়েদের মতো করে বলল, ‘তার আগে বলো, তুমি মিতু, না মিতুর মা?’

‘বুঝতে পারছ না গাধা?’

‘এখন বুঝতে পারছি, ও মিতু।’ সেলিম স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘কেমন আছ আমার গোলাপফুল?’

‘অত ঢঙ করতে হবে না, আগে বলো তোমার খবর কী?’

‘ভালো না।’

‘ভালো না মানে?’

‘রাগছ কেন মিতু সোনা, পৃথিবীর সমস্ত টাকা-পয়সা দিয়ে তোমাকে ডুবিয়ে রাখব, জানো?’

‘রাখো এখন এসব। তোমার বাবার খবর কী?’

‘বাবাটা না একটা ইয়ে...। মনে হয় বাবাকে গাছের ডালে হাত-পা বেঁধে তিন দিন ঝুলিয়ে রাখি।’

‘কিছু একটা করো, দ্রুত করো।’

‘হ্যাঁ।’ সেলিম হঠাৎ আড়চোখে দেখে বাবা ঘরে ঢুকে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভারটা কানে নিয়েই সেলিম বেশ হেসে হেসে বলে, ‘জানিস মতি, আমার বাবার মতো মানুষ হয় না, এত ভালোবাসে আমাকে, যখন যা চাই, তা-ই দেয়। বাবার সব কথাও সে জন্য আমি শুনি। আর শোন, এত ঘন ঘন ফোন করবি না, বাবা পছন্দ করেন না। রাখি রে মতি।’

ছালেহা বেগম বেশ চিৎকার করে বললেন, 'আপনি কথা বলছেন না কেন?'

কাঁথা দিয়ে মাথা ঢেকে খাটের এক কোনায় শুয়ে আছেন মফিজ সাহেব। সাধারণত বিকেলবেলা তিনি শুয়ে থাকেন না, কিন্তু আজ শুয়েছেন। তিনি যে ঘুমাচ্ছেনও না, এটাও টের পাওয়া যাচ্ছে। কারণ তিনি একটু পরপর মাথার ব্যথায় কুঁই কুঁই করে শব্দ করছেন আর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলছেন, 'আমি মরিয়া যাইব!'

মফিজ সাহেবকে দু'হাত দিয়ে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ছালেহা বেগম আবার বললেন, 'কথা বলছেন না কেন আপনি?'

আলতো করে মাথা থেকে কাঁথা সরিয়ে মফিজ সাহেব কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'কী বলিব আমি?'

'বিড়ালের বাচ্চার মতো কুঁই কুঁই করছেন কেন?'

'তুমি জানো না সেলিমের মা, আমি কেন কুঁই কুঁই করিতেছি?'

'না, জানি না।' রেগে রেগে কথাটা বললেন ছালেহা বেগম।

মফিজ সাহেব কাতর গলায় বললেন, 'জানো না!'

'সেই সকাল থেকে মাথাটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছেন। ঠাণ্ডা লেগেছে, না ব্যথা পেয়েছেন কোনো কিছুই বলছেন না। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাবও দিচ্ছেন না। এদিকে মাথাটা যে দেখব, তারও উপায় নেই, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। বলেন তো আপনার কী হয়েছে?'

বিছানা থেকে উঠে বসলেন মফিজ সাহেব। তারপর ছালেহা বেগমের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, 'রাতে আমি একটা খারাপ জিনিস দেখিয়াছি সেলিমের মা।'

ঘরের কোনায় কাজ করছিল চম্পা। মফিজ সাহেবের কথা শুনে হঠাৎ তার হাত থেকে কী যেন পড়ে যায় শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে ছালেহা বেগম বলেন, 'তুই ওখানে কী করছিস?'

'কাম করতাছি আম্মা।'

'কাজ করতে হবে না, যা এখন এখান থেকে।'

'কামডা শ্যাষ কইরা যাই?' চম্পা আড়চোখে মফিজ সাহেবের দিকে তাকায়।

'বললাম না, কাজ করতে হবে না এখন!'

'এখন তালি কী করমু?'

'বসে বসে গান গা।'

'আমি তো গান গাইতে পারি না আম্মা।'

'গান গাইতে পারিস না তো নাচ।'

'নাচতেও পারি না।'

'এই ছেমড়ি, এত কথা কেন, ভাগ এখান থেকে!'

ভয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে চম্পা ঘর থেকে দৌড়ে চলে যায়। ছালেহা বেগম মফিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী জিনিস দেখেছেন আপনি?'

'আমার বলিতে ইচ্ছা করিতেছে না।'

'কেন? আপনি কি স্বপ্ন দেখেছেন? কী স্বপ্ন দেখেছেন... নতুন একটা বিয়ে করে এনেছেন আপনি আর বাসর রাতে নতুন বউ আপনাকে'— ছালেহা বেগম হঠাৎ দু'হাত দিয়ে মফিজ সাহেবের গলা টিপে ধরার মতো করে বলেন, 'এভাবে গলা টিপে ধরেছে?'

'না।' কান্না কান্না শোনায় মফিজ সাহেবের গলা।

'তাহলে কি সন্ত্রাসীরা হাত-পা কেটে গরু-ছাগলের মতো কসাইখানায় ঝুলিয়ে আপনার শরীরের মাংস বিক্রি করছে?'

'না।'

'তবে কি মরুভূমির মধ্যে কেউ আপনার মাথা মাটির নিচে চাপা দিয়ে পা ওপরে তুলে রেখেছে?'

'নাগো না, স্বপ্নে এমন কিছুই দেখি নাই।'

'তাহলে?'

'আমার ঘরে রাতে একজন আসিয়াছিল?'

'বলেন কি! আমি তখন কোথায় ছিলাম?' আশ্চর্য হয়ে মুখটা হাঁ করে ফেললেন ছালেহা বেগম।

'তুমি তখন ঘুমাইতেছিলে।'

'ডাকলেন না কেন আমাকে?'

'ভয়ে আমি ভাষা হারাইয়া ফালাইয়াছিলাম সেলিমের মা।'

'কে এসেছিল– ছেলেমানুষ, না মেয়েমানুষ?'

ক্লান্ত গলায় মফিজ সাহেব বললেন, 'ছেলেমানুষের মতোই গলার স্বর, ছেলেই হইবে।'

'সত্যি বলছেন তো?'

'তবে কি মিথ্যা বলিলাম?'

সেলিম ঘরের আড়াল থেকে কথাগুলো শুনছিল চুপ করে। হঠাৎ সে খুক-খুক করে কেশে ঘরের ভেতর ঢুকেই মফিজ সাহেবের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'আব্বা, কে এসেছিল তোমার ঘরে, কখন এসেছিল?'

'রাতে আসিয়াছিল।'

'বলো কি! সে কি আসমান থেকে এসেছিল?'

মফিজ সাহেব হঠাৎ চমকে উঠে বলেন, 'সে যে আসমান হইতে আসিয়াছিল, তাহা তুই জানিলি কীভাবে?'

'রাতে কেউ এলে তো আসমান থেকেই আসে।' সেলিম কথাটা বলতে বলতে মফিজ সাহেবের পাশে বসে, 'তা সে কী বলেছে?' কথা বলছে সেলিম আর আস্তে আস্তে তোশকের নিচে মফিজ সাহেবের টাকা রাখার জায়গায় হাত ঢোকাচ্ছে চুপি চুপি।

'বিবাহের কথা বলিতে আসিয়াছিল।'

'সে আমার বিয়ে নিয়ে কী বলল?'

'সে যে তোর বিবাহ লইয়া কথা বলিতে আসিয়াছিল, ইহা জানিলি কী করিয়া?'

ছালেহা বেগম হঠাৎ গদগদ করে বলেন, 'বিয়ের কথা বলতে এলে কি তোমার বিয়ের কথা বলবে নাকি?'

মফিজ সাহেব শরম শরম হাসি দিয়ে বলেন, 'কেন, আমার কথা বলিতে পারে না, আমি কি বুড়া হইয়া গিয়াছি?'

'বুড়ো হয়েছেন, না যুবক আছেন, টের পান না এখনো!' ছালেহা বেগম মফিজ সাহেবের গালে একটা খোঁচা দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ান। তারপর ঘরের এক কোনায় গিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকেন।

মফিজ সাহেব অজান্তেই তোশকের নিচে তার টাকা রাখার জায়গায় হাত রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে টের পান সেলিম সেখানে আগেই হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তিনি কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, তার আগেই সেলিম ধরা পড়ার হাসিতে বলল, 'ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ, হাতটা গরম করতে তাই এখানে ঢুকিয়ে রেখেছি।'

'গরম লাগে?' মফিজ সাহেব সরাসরি সেলিমের চোখের দিকে তাকান।

মাথাটা উঁচু-নিচু করে সেলিম।

'বাপজান।' মফিজ সাহেব দাঁত কিড়মিড় করে বলেন, 'এইখানে বেশি গরম জিনিস আছে, হাতটা বাহির করো, না হইলে হাতটা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।'

সেলিম আস্তে আস্তে তোশকের নিচ থেকে হাতটা বের করে মুখটা কাচুমাচু করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হনহন করে প্রমা ঢোকে ঘরে। ঢুকেই মফিজ সাহেবের বিছানার ওপর নিজের ব্যাগ এবং বইগুলো ছুড়ে দিয়ে বলে, 'বাবা, তুমি গাড়ি কিনবে কবে, বলো।'

মফিজ সাহেবের কলজের ভেতর ধক্ করে ওঠে। তিনি আমতা আমতা করে বলেন, 'আম্মা, গাড়ি? কিসের গাড়ি?'

বিরক্ত মুখে প্রমা কিছুটা শব্দ করে বলে, 'তুমি আগে বলো, গাড়ি কিনবে কি না?'

'কেন, কী হইয়াছে আম্মা?'

'এতগুলো ছেলের মাঝে গাদাগাদি করে, গায়ের সাথে গা লাগিয়ে ভার্সিটিতে যেতে ভীষণ কষ্ট হয় বাবা।' অভিমানে গজগজ করতে করতে কথাটা বলে প্রমা তার নিজের ঘরে চলে যায়।

'হ্যাঁ, একটা গাড়ি কেনা দরকার।' ঘরের কোনা থেকে এদিকে এগিয়ে আসতে আসতে ছালেহা বেগম বলেন, 'আপনার মানসম্মান না থাকতে পারে, ওদের একটা মানসম্মান আছে।'

'কে বলিল আমার মানসম্মান নাই!'

'পাশের বাসার ওই অল্পবয়সী বিধবা মহিলাকে আপনি কী বলেছেন?'

অপরাধীর মতো মুখটা কাচুমাচু করেন মফিজ সাহেব, 'আমি আবার ওকে কী বলিলাম!'

'কিছু বলেন নাই?'

'মনে পড়িতেছে না তো, সেলিমের মা।'

'আপনি সারা দিন একে-ওকে যা যা বলেন, রাতে ঘুমের ঘোরে সে কথাগুলো বলে ফেলেন, এটা জানেন তো?'

'আমি তাহাকে কী বলিয়াছি?'

'আপনি তাকে...।'

কথাটা শেষ করতে পারেন না ছালেহা বেগম। তার আগেই মফিজ সাহেব ছালেহা বেগমের মুখটা হাত দিয়ে ঠেসে ধরে নিজের জিভটা কামড় দিয়ে বলেন, 'মিথ্যা কথা, একেবারে মিথ্যা কথা।' হঠাৎ ছালেহা বেগমের মুখটা ছেড়ে দিয়ে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে বলেন, 'ইয়া মাবুদ, তুমি মাফ করো।'

কথাটা বলেই আবার কাঁথা দিয়ে মাথা ঢেকে বিছানায় শুয়ে পড়েন মফিজ সাহেব। একটু পরপর মাথা তুলে কাঁথার ফাঁক দিয়ে পিটপিট করে তাকান ছালেহা বেগমের দিকে। এক সময় হঠাৎ তার দিকে সরাসরি চোখ পড়তেই মফিজ সাহেব অজ্ঞান হওয়ার মতো শুয়ে পড়ে বিড়বিড় করে বলেন, 'এবার আমি মরিয়া যাইব, সত্যি সত্যি মরিয়া যাইব।'

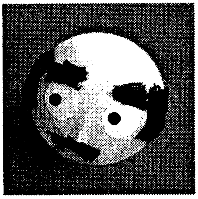

বাসার সামনে এ মুহূর্তে লাল টকটকে একটা গাড়ি এসে থামল, সেলিম যদি এ কথাটা জানত, তাহলে সে হয় বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকত চুপচাপ, না হয় খাটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকত সিঁদেল চোরের মতো। কিন্তু এ দুটোর কোনোটাই করার সুযোগ পেল না সে। টেবিলের সামনে বসে বসে সে একটা চিঠি লেখার চেষ্টা করছিল মিতুকে। কিন্তু শুরুটা সে কীভাবে করবে, তা-ই খুঁজে পাচ্ছিল না। এদিকে সময় চলে গেছে প্রায় দেড় ঘণ্টা এবং পৃষ্ঠাও নষ্ট হয়ে গেছে প্রায় পনেরোটা। ব্যাপার হলো, মিতুকে চিঠিটা না লিখতে পারলেও মিতু স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছে তার ঘরে।

মিতু কখন যে সেলিমের ঘরে ঢুকেছে, টের পায়নি সে একবিন্দুও। প্রায় নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পলকহীনভাবে তাকিয়ে দেখছিল সেলিমকে। এক সময় হঠাৎ সে খামচে ধরার মতো সেলিমের কাঁধটা চেপে ধরে। ঝট করে ঘুরে তাকিয়েই চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলে সেলিম। মানুষ মাথাকাটা ভূত কিংবা জলজ্যান্ত একটা বাঘকে সামনে দেখলেও বোধহয় এমনভাবে তাকাত না।

সেলিম পোষা বিড়ালবাচ্চার মতো মিঁউ মিঁউ করে বলল, 'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি, কোনো অসুবিধা আছে?'

'অসুবিধা কিসের, অসুবিধা নেই?' আগের মতোই মিঁউ মিঁউ করে বলল সেলিম।

'তাহলে?'

'কেন এসেছ গোলাপফুল?'

'তোমাকে আজ গলা টিপে মারব।'

চমৎকারভাবে হেসে ফেলে সেলিম, 'তোমার মা তোমার বাবাকে যেভাবে মারতে চায় মাঝে মঝে, সেভাবে?'

'কী!'

'যা-ই করো, মারার পর জিহ্বাটা যেন গলা দিয়ে বের হয়ে না আসে আমার।'

মিতু রেগে ফোঁস ফোঁস করে বলল, 'বের হয়ে এলে কী হবে?'

'চেহারাটা নষ্ট হয়ে যাবে না আমার!' আদুরে গলায় কথাটা বলে সেলিম একটু এগিয়ে এলো মিতুর দিকে।

'মরে গেলে তোমার চেহারা ধুয়ে কি আমি পানি খাব?'

'অমন করে বলে না লক্ষ্মীটি, দিলে বড় কষ্ট লাগে।'

'লাগুক।'

'লাগবে?'

'হ্যাঁ লাগুক, তুমি সকালে ওভাবে কথা বললে কেন?'

'কীভাবে বললাম?'

'মেয়েদের মতো করে কথা বললে কেন তুমি?'

'কই মেয়েদের মতো কথা বললাম?'

'বলনি?' চিৎকার করে ওঠে মিতু।

'এমন করে জোরে জোরে কথা বোলো না জান, বুকে ধাক্কা লাগে।'

সেলিম দু'হাত বাড়িয়ে মিতুর দিকে একটু এগিয়ে আসে।

'খবরদার, এগিয়ে আসবে না একটুও।'

'কেন গো!'

'তোমাকে আমার এখন অসহ্য লাগছে।'

'সোনামণি, জানো না ঘৃণার পর যেমন ভালোবাসা, অসহ্যের পর তেমনি সহ্য? জানো ফুলভানু...।'

'কী বললে?'

'কেন, ফুলভানু?'

'অসভ্য, ফুলভানু আমার আম্মার নাম।'

সেলিম দাঁত দিয়ে জিভ কেটে দু'হাত একসঙ্গে করে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'স্যরি, আমি তোমার হাতের মধ্যে পা দিয়ে, স্যরি আমার হাতের মধ্যে তোমার পা দিয়ে মাফ চাই।'

ফিক করে হেসে ফেলে প্রমা। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরে সেলিম আর মিতুর ঝগড়া শুনতে শুনতে সে হাসতে থাকে। ঠিক তখনই মফিজ সাহেব নিঃশব্দে তার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আম্মাজান, হাসো কেন?'

'এমনি বাবা।'

'এমনি কেউ হাসে?'

'হাসে বাবা, হাসে।'

'শুনিয়াছি, জিন-ভূতে ধরিলে নাকি মানুষ একা একা হাসে?'

'আমাকে জিনে ধরেছে বাবা।'

'অ্যা, বলো কি!'

'না বাবা, এটা খুব ভালো জিন। এ জিনের না অনেক টাকা-পয়সা!'

'তোমাকে কি কিছু দিয়েছে?'

'না বাবা, এখনো দেয়নি, তবে দেবে।'

মফিজ সাহেব মোসাহেবি হাসি দিয়ে বলেন, 'একটু বেশি করিয়া লইয়ো আম্মা, আমারে একটু দিও।' হঠাৎ মফিজ সাহেব সেলিমের ঘরের দিকে কানখাড়া করে বলেন, 'ঘরের ভিতর চিৎকার কিসের?'

প্রমা একটু থতমত খেয়ে বলে, 'ভাইয়া নাটক করছে বাবা।'

'কিন্তু মেয়েমানুষের গলা শুনিতেছি যে?'

আগের চেয়ে আরো বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে প্রমা। কিন্তু হঠাৎ বুদ্ধি পেয়ে চোখ দুটো চকচক করে বলে, 'ওটা ক্যাসেটে রেকর্ড করা কণ্ঠ বাবা।'

প্রমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে মফিজ সাহেব বলেন, 'চলো তো আম্মা, দেখি ব্যাপারটা।'

মফিজ সাহেবের একটা হাত সঙ্গে সঙ্গে টেনে ধরে প্রমা, তারপর আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গি করে বলে, 'একি করছ বাবা, ভাইয়ার তো তাহলে নাটক করার মুড নষ্ট হয়ে যাবে!'

'তোমার মা কই?'

'চম্পাকে নিয়ে পাশের বাসায় গেছে।'

মফিজ সাহেব ভীষণ চমকে ওঠেন, 'কেন, কেন!'

'এমনি বাবা।'

'সত্যি এমনি তো?'

'বললাম তো, এমনি।'

'তিন সত্যি বলো।'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

প্রমার একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের মাথার ওপর ঠেকিয়ে মফিজ সাহেব বলেন, 'আমার মাথা ছুঁইয়া বলো।'

'আহ্ বাবা! তুমি এমন করছ কেন?' প্রমা মফিজ সাহেবের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয়।

'এমনি আম্মাজান।'

'সত্যি এমনি তো?'

'বললাম তো, এমনি।'

'তিন সত্যি বলো।'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

মফিজ সাহেবের একটা হাত ধরে প্রমা এবার নিজের মাথায় ঠেকিয়ে বলে, 'আমার মাথা ছুঁয়ে বলো।'

'মাগো, নিজের বাবারে তুমি অবিশ্বাস করিলা, দিলে বড় আঘাত পাইলাম রে মা, কষ্ট পাইলাম বহুত।'

'না বাবা, না বাবা, ঠিক আছে। আমার মাথা ছুঁতে হবে না।'

'তোমার মা যে কেন ওইখানে গেল।'

'ও কথা বলছ কেন বাবা?'

'না, এমনি। তোমার মাকেও তোমার ভাইয়ের প্রতিভাটা দেখাইতে পারিতাম। কাজ নাই কাম নাই না-ট্-ট-ক করিতেছে।'

'এভাবে কথা বলছ কেন বাবা?'

'কী হইবে নাটক করিয়া, ও কি জাহিদ হাসান হইবে নাকি?'

'হতেও তো পারে।'

'হুহ্! ও হইবে জাহিদ হাসান। একটা চাকরি জোগাড় করিতে পারে না, কোনো কাজকাম করিতে পারে না, হুহ্! আবার বিবাহ করিতে চায়।' কথাটা বলতে বলতে মফিজ সাহেব সেলিমের ঘরের দিকে এগিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে প্রমা দৌড়ে গিয়ে মফিজ সাহেবকে টেনে ধরে। মফিজ সাহেব সেলিমের দরজাকে পেছনে রেখে ঘুরে দাঁড়ান। ঠিক তখনই মিতু দরজা খুলে বের হয়ে আসে সেলিমের ঘর থেকে। রাগে সামনে কোনো কিছু খেয়াল না করে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগায় মফিজ সাহেবের পিঠে। মফিজ সাহেব ছিটকে পড়ে যান উপুড় হয়ে। মিতু খুট-খুট করে হেঁটে যায় বাসার দিকে, একটু পর তার গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ পাওয়া যায়।

মফিজ সাহেব সেভাবেই শুয়ে আছেন উপুড় হয়ে। প্রমা দ্রুত কাছে গিয়ে হাত ধরে তাকে টেনে তুলতেই মফিজ সাহেব বললেন, 'মা, এটা কি নাটকের কোনো দৃশ্য ছিল?'

প্রমা মাথাটা উঁচু-নিচু করে বলল, 'হ্যাঁ বাবা।'

মফিজ সাহেব কোমরে হাত দিয়ে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে বললেন, 'তা মা, এই নাটকের ভেতর আমারে ধাক্কাটা মারিল কে?'

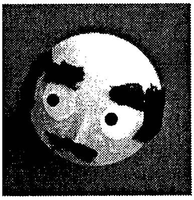

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে সেলিম। কোনো কিছু ভেবে পাচ্ছে না সে, ভেবে পাচ্ছে না এ মুহূর্তে তার কী করা উচিত। কেন সে ওভাবে সেদিন কথা বলেছে, মিতু তো তা বলার সুযোগ দেয়ইনি, এমনকি অনেক চেষ্টা করেও সেটা বলার সুযোগ পায়নি সে। আর মিতু আজ যেভাবে রেগে গেল, তাতে যে ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলবে, সে সাহসও হচ্ছে না তার। ও যদি জানত, তার মহাকৃপণ বাবা ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছে এবং শুনছিল, তাই সে অবস্থায় ভাবে কথা না বলে কোনো উপায় ছিল না তার। মেয়েদের এই একটা ব্যাপার, ভালোবাসলে মনপ্রাণ উজাড় করে ভালোবাসে, আর যখন জেদ ধরে তখন মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে ধরে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উপুড় হয়ে টেবিলের ওপর মাথাটা ঠেকিয়ে দেয় সেলিম।

ঘুমটা প্রায় এসে গিয়েছিল সেলিমের, ঠিক সে সময় মাথায় একটা স্পর্শ পেয়ে আলতোভাবে মুখটা তুলে পাশ-ফিরে তাকায় সে। সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো একটা চিৎকার দিয়ে বলে, 'ছোট মামা তুমি!'

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'একদম না।'

'কেন?'

'টেবিলে মাথা রেখে আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই আধোঘুমেই স্বপ্ন দেখেছি, তুমি এসে আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছ।'

পাশ থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে মামা বলেন, 'তাড়াতাড়ি এবার সমস্যাটা বল দেখি।'

'তোমাকে যে কী বলব মামা।'

'চিঠিতে যা লিখেছিস তা-ই বল। আর শোন, আমার সামনে বসে এত চিন্তা করবি না তো! দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকদের আমি একদম দেখতে পারি না।'

'মামা, এবার ভালো একটা বুদ্ধি না দিলে একেবারে মার্ডার হয়ে যাব!'

'মেয়েটার কি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

মামা একটু ভেবে বলেন, 'নো চিন্তা।'

'মামা, আমি আপাতত বিয়ে নিয়ে চিন্তা করছি না।'

'তাহলে এভাবে রানীক্ষেত রোগে-ধরা মুরগির মতো ঝিমাচ্ছিস কেন?'

সকাল থেকে এই একটু আগ পর্যন্ত মিতুর সঙ্গে কী হয়েছে, মামাকে এক মিনিটের মধ্যে তা বর্ণনা করল সেলিম। কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামা হো-হো করে হাসতে লাগলেন। হঠাৎ খুক-খুক করে কাশতে লাগলেন মামা। সেলিম একটু এগিয়ে এসে মামার বুকে হাত দিয়ে বলল, 'তোমার যক্ষ্মা হয়েছে নাকি মামা!'

খুক-খুক করতে করতেই মামা বললেন, 'না।'

'তাহলে ওভাবে কাশছ কেন?'

'গলার ভেতর মশা গেছে।'

'তাতে কী, গিলে ফেলো!'

'গিলে ফেলব?'

'আরে বাবা, সব মাংসেই প্রোটিন আছে, মশার মাংসেও আছে। ফ্রি ফ্রি প্রোটিন পাচ্ছ, ক্ষতি কী!'

'আচ্ছা, পেটের ভেতর মশা আবার বাচ্চা দেবে না তো!'

'পেটের ভেতর কেউ বাচ্চা দেয় নাকি?'

'কেন, কৃমি দেয় না?' মামা একটু থেমে বলেন, 'ছোটবেলায় শুনতাম, কোনো ফলের বিচি গিলে খেলে নাকি পেটের ভেতর গাছ জন্মায়, তারপর গাছটা বড় হলে মাথা ফেটে বের হয়। তাই ভাবছি, মশা যদি পেটের ভেতর বাচ্চা দেয়, তাহলে তো পেটের ভেতর ভীষণ কামড়াবে।'

'এখন ওসব রাখো তো মামা! আমি এখন কী করব তাই বলো।'

'তোর কিছু করতে হবে না, আমিই সব করে দিচ্ছি।'

'তুমি করে দেবে?'

'হ্যাঁ, তার আগে তুই আমায় পায়ে ধরে সালাম কর।'

'আমি কেন সালাম করতে যাব, কাজ না তুমি করবে!'

'কাজটা কার?'

'আমার।'

'তাহলে আমি কি তোকে পায়ে ধরে সালাম করব?'

'করতে পার, কিন্তু কাজটা করা কি ঠিক হবে মামা?'

ড্রইংরুমে মামাকে বসে থাকতে দেখেই মিতু কিছুটা চিৎকার করে বলল, 'মামা আপনি!'

'কত দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা?'

'অনেক দিন পর।'

'তা তুমি কেমন আছ?'

'ভালো না মামা।'

'সে জন্যই রাত করে হলেও তোমার কাছে আসতে হলো।'

'সেলিম আমার সঙ্গে যা করল!'

‘আমি তোমার কাছে সে জন্যই এসেছি মিতু। ও একটা গাধার বাচ্চা, ও নিজেও একটা গাধা।’

‘গাধার বাচ্চা তো গাধাই হবে মামা।’

‘ও ডবল গাধা।’

‘গাধারা তাদের মামাদের কী ডাকে মামা? গামা?’

‘তা তো জানি না মিতু, সত্যি একটা ইমপর্টেন্ট কোশ্চেন।’

‘মামা, সেলিম এখন কী করছে?’

‘চিন্তায় চিন্তায় কেমন যেন হয়ে গেছে ও, বিয়ের জন্য এমন কিছু নেই যা করার চেষ্টা করছে না, সম্ভবত পাগল হয়ে যাবে ও।’

‘ভবিষ্যতের একটা পাগলকে কি বিয়ে করা ঠিক হবে মামা?’

‘তুমি ভালোভাবে একটা কথা বলো, ও ঠিক হয়ে যাবে।’

‘ও? ও তো ভালোভাবে দুটো কথা বলতে পারে!’

‘ভালো কথা কীভাবে বলতে হয় মিতু?’

‘মামা, আপনি জানেন না, ভালো কথা কীভাবে বলতে হয়?’

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মামা বলেন, ‘কীভাবে জানব বলো, এ পর্যন্ত কেউ আমাকে তেমন ভালো কথা বলেনি মিতু। তাই বিয়েটাও করতে পারলাম না। সে এক ট্রাজেডি। মাঝে মাঝে আমার বুক ফেটে আসে, মনে হয় গাছের ডালে উঠে মাটিতে ঝাঁপ দিই।’

‘মামা, আপনি তো গাছেই চড়তে জানেন না।’

‘সে জন্যই তো এখনো বেঁচে আছি। কিন্তু কীভাবে যে বেঁচে আছি, কেউ যদি সেটা জানত। তুমি কি আমার হাতটা একটু ধরবে মিতু?’

‘এটা আপনি কী বললেন মামা!’

‘আমাকে আসলে কেউ বোঝে না মিতু।’

কাঁদো কাঁদো চেহারায় মামা হঠাৎ হনহন করে বেরিয়ে যান মিতুদের ঘর থেকে। একটু পরে ফিরে এসে বলেন, ‘মিতু তুমি হাসছ?’

‘না মামা, আপনার মতো কান্নার চেষ্টা করছি।’

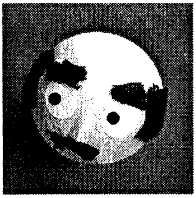

ছালেহা বেগম রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রমার ঘরের কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালেন। ঘরের ভেতর প্রমা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বড় বড় করে ফেললেন তিনি। কারণ প্রমা তো ঘরে একা থাকে, তার সঙ্গে তো কেউ থাকে না, এত রাতে তার ঘরে কে এলো?

কপালটা কুঁচকে ফেললেন ছালেহা বেগম। তবে কি তাদের চোখের আড়াল করে প্রমা কাউকে ঘরে ঢুকিয়েছে? এত বড় সাহস ওর? ছি ছি, মানুষজন জানলে ভাববে কী!

দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ছালেহা বেগম। ঘরের ভেতর প্রমা কার সঙ্গে কথা বলে, কী কথা বলে তা ভালোভাবে শোনা দরকার।

'শোনো, কাল কিন্তু আমরা ক্লাস করব না, কালও আমরা বেড়াতে যাব। ইস্! যদি একটা গাড়ি থাকত। জানো, বাবাকে না গাড়ি কেনার কথা বলেছি।'

দরজার দিকে আরো একটু এগিয়ে এলেন ছালেহা বেগম। ঘরের ভেতর নিশ্চয় একটা পুরুষমানুষ আছে, ওই অসভ্য ছেলেটার কথাও শোনা দরকার। কিন্তু ছালেহা বেগম কোনো পুরুষকণ্ঠ শুনতে পেলেন না। প্রমা আবার বলছে, 'জানো, আমার না কোনো কিছু ভালো লাগে না। মনে হয় সবকিছু ছেড়ে তোমার কাছে চলে যাই।'

খুক করে একটু কেশে ফেললেন ছালেহা বেগম, কিন্তু আরো কাশতে নিয়েই নিজের হাতে নিজেই মুখটা চেপে ধরলেন।

'কী বললে, কেন ভালো লাগে না? কেন ভালো লাগে না তুমি জানো না? আচ্ছা, তুমি কি তোমার বাবা-মাকে আমার কথা বলেছ?'

সমস্ত শরীর টানটান করে ছালেহা বেগম কথাগুলো শুনছেন, কানটা আরো একটু ঠেসে দিলেন দরজার সঙ্গে।

'কেন বলনি, তুমি যে কী না!' প্রমা একটু থেমে বলে, 'না না, আমিও আমার বাবা-মাকে বলিনি। শোনো, আমাকে নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না। আমার বাবা-মা রাজি না হলে কোনো অসুবিধা নেই, আমি সবকিছু ছেড়ে তোমার কাছে চলে আসব।'

'আঁও!' ছোট্ট একটা চিৎকার দিয়ে ফেললেন ছালেহা বেগম। কথাটা শুনেই তিনি দৌড়ে চলে গেলেন মফিজ সাহেবের কাছে।

'হ্যাঁ, তোমাকে বললাম না এটা কান্তার মোবাইল! একদিনের জন্য চেয়ে এনেছি ওর কাছ থেকে, কেবল তোমার সঙ্গে কথা বলব বলেই তো এনেছি। ৩০০ টাকার

একটি কার্ড ঢুকিয়েছি, কার্ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত কথা বলব আজ।' প্রমা একটু চুপ করে বলে, 'না না, আপাতত বাবার কাছে মোবাইল চাইতে পারব না।'

হন্তদন্ত হয়ে ছালেহা বেগম ঘরে ঢুকেই বেশ জোরে হাত রাখেন মফিজ সাহেবের পিঠে। নিমগ্নচিত্তে কী যেন চিন্তা করছিলেন তিনি। হঠাৎ পিঠে বেশ জোরে একটা স্পর্শ পেয়েই তিনি চমকে উঠে বলেন, 'কে, কে...?'

'জিন না, ভূতও না, আমি।' ছালেহা বেগম রাগে মুখ বাঁকা করে বলেন, 'চমকে ওঠার ঢঙ দেখো!'

'কী হইয়াছে সেলিমের আম্মা?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে।' কাঁদো কাঁদো মুখ করেন ছালেহা বেগম।

'সর্বনাশ!' কিছুটা লাফিয়ে ওঠেন মফিজ সাহেব, 'কখন হইল, কোথায় হইল!'

'প্রমার ঘরে।'

'আগুন লাগিয়াছে?'

'না।'

'ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে?'

'না।'

'চুরি হইয়াছে?'

'না।'

'তাহা হইলে?'

'দরজা বন্ধ করে প্রমা ঘরের ভেতর কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।'

'কাহার সঙ্গে!'

'সেটাই তো জানি না। তবে পুরুষমানুষ।'

'বলো কি!'

'তবে আর বলছি কি!' আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকতে ঢাকতে ছালেহা বেগম বলেন, 'কবে থেকে যে এ কাজটা করছে ও, আমরা কিছুই জানি না!'

খাট থেকে নামতে নামতে মফিজ সাহেব বললেন, 'চলো তো দেখি।'

পা টিপে টিপে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মফিজ সাহেব প্রমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। এক হাত দিয়ে তিনি ধরে রেখেছেন ছালেহা বেগমকে। কিছুক্ষণ পর দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে কথা শোনার চেষ্টা করলেন তিনি। হঠাৎ হাসতে হাসতে মফিজ সাহেব বললেন, 'আরে দূর, ও নাটক করিতেছে।'

'নাটক করছে!' ছালেহা বেগম আশ্চর্য হয়ে যান।

'হ্যাঁ। ওই রকম নাটক সেলিমও করে।'

'প্রমা একা একা ঘরের ভেতর কার সঙ্গে এটা করবে?'

'একা একাও নাটক করা যায়।'

'তুমি জানলে কী করে?' কথাটা বলেই ছালেহা বেগম মফিজ সাহেবকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করেন।

কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে তিনি দরজার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মফিজ সাহেবের দিকে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে মফিজ সাহেব বলেন, 'সর্বনাশ! তুমি ওইভাবে দাঁড়াইয়াছ কেন?'

ছালেহা বেগম সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

'নাটকের সময় ওইভাবে দরজার দিকে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলে কে যেন পিছন হইতে ধাক্কা মারে।'

ছালেহা বেগম চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, 'কী বললে, ধাক্কা মারে! তুমি জানলে কী করে ধাক্কা মারে?'

'জানি গো, জানি।'

'কে ধাক্কা মারে?'

কোমরে হাত দিয়ে ব্যথায় কোঁকাতে কোঁকাতে মফিজ সাহেব বলেন, 'আমি জানি না। কেবল জানি, ধাক্কা মারলে উপুড় হইয়া পড়িয়া যাওয়া যায়, কোমরে ব্যথা পাওয়া যায়।'

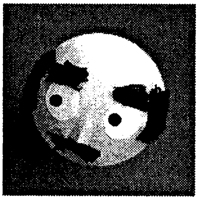

রান্নাঘরে চম্পা রান্না করছিল আর গান গাইছিল গুনগুন করে। মামা পা টিপে টিপে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে চুপ করে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন, রান্নাঘরে চম্পা একা। মামা আগের চেয়েও নিঃশব্দে পা ফেলে রান্নাঘরের ভেতরে ঢোকেন। তারপর বেশ আদুরে গলায় ডাক দেন, 'চ-ম-পা!'

গান থামিয়ে চম্পা ঘুরে দাঁড়িয়ে মামাকে দেখে বলে, 'মামা আপনে!'

'বুবু কোথায় চম্পা?'

'পাশের বাসায় গেছে।'

'ভালো, তা তোমার কাছে একটা কাজে এলাম।'

'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী কাজ মামা?'

'বলব বলব' মামা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে থাকেন।

'হাসলে না আপনারে বড় সুন্দর লাগে মামা!'

'যাও, তুমি যে কী বলো না চম্পা!' মামা ভীষণ লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গি করেন।

'মামা এবার বলেন, কী জন্য আসছেন?'

'তুমি না খুব সুন্দর করে গান গাইতে পার, তোমার গলাটা বড় চমৎকার।'

'যে শোনে সে-ই কয়।'

'আর কে কে বলে?'

'কওয়ন যাইব না।'

'কেন?'

'থাক, ওসব শুনতে হইব না। আপনি কী জন্য আসছেন তাই বলেন।'

খুব দুঃখী দুঃখী গলায় মামা বলেন, 'তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে চম্পা?'

'কী সাহায্য মামা?'

'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি একটু বুঝিয়ে দেবে?'

'অবশ্যই মামা, আমার মাথায় অনেক জ্ঞান।'

'তা জানি। জ্ঞান আছে বলেই তো তুমি ভালো গান গাইতে পার।'

'তা বলেন মামা, কী করতে অইব।'

'সেলিমের একটা সমস্যা।'

কথাটা শেষ করার আগেই চম্পা বলে, 'ভাইয়ার সমস্যা! কী সমস্যা?'

'আচ্ছা, আপাতত এটা থাক, যদিও কাজটা ওকে নিয়েই। আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারবে, মেয়েরা কোন কথাটা শুনলে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়?'

কিছুটা লজ্জা পেয়ে চম্পা বলে, 'সেইটা আমি জানুম কেমনে?'

'তুমি জানো না?'

'না।'

'আচ্ছা, আমি একটা কাজ করি, আমি তোমাকে কিছু একটা বলি, দেখো তো এতে তোমার মনে খুশি লাগে কি না।'

শাড়ির আঁচলটা মুখে গুঁজে ফিক করে হেসে ফেলে চম্পা, 'বলেন।'

'তুমি কেমন আছ বন্ধু?'

'বন্ধু কথাডা ভালো লাগে না।'

মামা কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'তাহলে?'

'এই ধরেন জান, হৃদয়, প্রাণ, কোকিলা পাখি... ।'

'ঠিক আছে, আমি আবার বলছি। তুমি কেমন আছ আমার জান?'

'ভালো।' চম্পা আগের মতোই মুখে আঁচল গুঁজে বলে।

'আপাতত তোমার জবাব দেওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে?'

'জি মামা।'

'তুমি কেমন আছ আমার কোকিলা পাখি... ।'

'ভালো।'

'আহ্, তোমাকে না বললাম আপাতত তোমার জবাব দেওয়ার দরকার নেই!'

'আসলে অভ্যাস হইয়া গেছে তো!'

'অভ্যাস হয়ে গেছে মানে?'

'সব সময় 'ভালো, ভালো' বলি তো!'

'কাকে 'ভালো, ভালো' বলো।'

জিভ কেটে চম্পা চোখ দুটো কিছুটা বড় বড় করে বলে, 'কী থুইয়া যে কী কই, ছরি মামা, ভুল অইয়া গেছে, আর অইব না।'

'আমি আবার শুরু করি। চম্পা, আমার চমচম, আমার চটপটি, আমার পানির গ্লাস, আমার চটি স্যান্ডেল... ।'

চম্পা হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে, 'এইটা আপনি কী কইলেন মামা-চটি স্যান্ডেল!'

'এবার আমি স্যরি চম্পা, চটি স্যান্ডেল বললে মেয়েরা রাগ করে এটা বোঝা গেল। আমি আবার শুরু করি?' মামা আয়েশি ভঙ্গিতে চম্পার দিকে তাকান।

'করেন।'

'আমার হৃদয়রাজ্যে আমি তোমাকে কোথায় যে রেখেছি, তা কি তুমি জানো, তুমি আমার হৃদয়।' চম্পার মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে, সে মিষ্টি করে হাসতে থাকে। তা দেখে মামা বলেন, 'কথাগুলো শুনে তুমি খুশি হয়েছ?'

খুশিতে মাথাটা বেশ কয়েকবার উঁচু-নিচু করে চম্পা।

'আমি আবার শুরু করি। তোমার জন্য আমি কী না করতে পারি ময়না, তুমি আমার। তুমি আমার কাছে আসো টিয়াপাখি।' মামা আস্তে আস্তে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে যান চম্পার দিকে। ঠিক তখনই পাশের বাসা থেকে ফিরে আসেন ছালেহা বেগম। রান্নাঘরের ভেতর ভাইয়ের গলা শুনেই থমকে দাঁড়ান তিনি। আস্তে আস্তে এগিয়ে যান রান্নাঘরের দরজার দিকে।

'আমার প্রাণ, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, তোমাকে ছাড়া আমি...।' থেমে যান মামা, কোনো কথা খুঁজে পান না, হঠাৎ হেঁশেলের আগুনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমাকে ছাড়া আমি আগুনের মধ্যে ডুব দেব, ডুব দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মারা যাব।'

'আগুনের মধ্যে আবার ডুব দেয় কেমনে, ডুব দেয় তো পানির মধ্যে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, এই গুরুত্বপূর্ণ ভুলটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। ও, কোথায় যেন শেষ করলাম?'

'আমাকে ছাড়া আপনে বাঁচবেন না।'

'ও হ্যাঁ, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আবার শুরু করি—আমার প্রাণকোকিলা, আমার চড়ুইপাখি।' মামা চম্পার একটা হাত ধরে ফেলেছেন। লজ্জায় চোখ দুটো বুজে আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে চম্পা। এ সময় সেলিমের মা রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন এবং পাশে রাখা একটা স্টিলের প্লেট হাতে নিয়ে ফেলেন তিনি। আবেশে মামাও চোখ দুটো বুজে ফেলেছেন এবং চোখ বুজেই তিনি বলছেন, 'আমার আলু, আমার পটল, আমার বেগুন।' মামা হাঁটু মুড়ে চম্পার সামনে বসে পড়েন, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ফিরিয়ে দিও না লক্ষ্মীটি, আমি তোমার পায়ে পড়ি।'

সঙ্গে সঙ্গে স্টিলের প্লেট দিয়ে পেছন থেকে ভাইয়ের মাথায় বাড়ি মারেন ছালেহা বেগম, বাড়ি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। ছালেহা বেগম অজ্ঞান অবস্থায়ই প্লেট দিয়ে ভাইয়ের মাথায় আরেকটা বাড়ি দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে বলতে থাকেন, 'সব পুরুষেরই এক স্বভাব!'

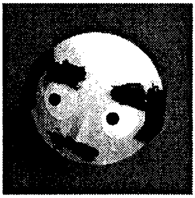

মুখটা হাঁ হয়ে আছে মফিজ সাহেবের। গভীর ঘুমে মগ্ন তিনি। প্রতিদিনের মতো আজও তিনি বুক পর্যন্ত খাটো ফতোয়াটা পরেছেন। কিন্তু অজ্ঞাত এক কারণে আজ খাটের নিচে পড়ে আছে তার কোলবালিশটা। কিছুটা তেল-চিটচিটে কোলবালিশটাতে বেশ কয়েকটা তেলাপোকা এসে হাঁটাহাঁটি করছে মর্নিংওয়াকের মতো। তার পাশে খাটের এক কোনায় ছালেহা বেগম এমন গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছেন, যেন প্রচণ্ড শীত করছে তার।

টেলিফোনটা বেজে ওঠে হঠাৎ। মাঝরাত। কিছুক্ষণ বাজার পর ঘুমজড়িত চোখে ফোনটা রিসিভ করলেন মফিজ সাহেব। কিন্তু তিনি 'হ্যালো' বলার আগেই একটা মেয়ে বলল, 'যাও, তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

মফিজ সাহেবের ঘুমটা ভেঙে যায় পুরোপুরি। চোখ থেকে সব ঘুম উধাও। বড় বড় চোখ করে তিনি টেলিফোনের রিসিভারের দিকে তাকান।

'তোমাকে ছাড়া আমি আসলে বাঁচব না।'

চোখ দুটো এবার চিকচিক করে ওঠে মফিজ সাহেবের। তিনি শোয়া অবস্থা থেকে ঝট করে উঠে বসেন। কিন্তু ঝট করে উঠে পড়লেও এতটা নিঃশব্দে উঠে বসেন, যেন স্ত্রী ছালেহা বেগম ঘুণাক্ষরেও এ মুহূর্তে জেগে না ওঠেন।

পা দুটো গুটিয়ে তিনি আয়েশ করে বসে রিসিভারটা ভালো করে কানের সঙ্গে ঠেকিয়ে কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে মেয়েটা বলে, 'তুমি ইদানীং খুব সুন্দর হয়েছ, জানো?'

খাটের পাশে রাখা ড্রেসিং টেবিলের দিকে মুখ বাড়ান মফিজ সাহেব। কিন্তু সে পর্যন্ত মুখ না যাওয়ায় একটু উপুড় হয়ে আয়নার দিকে তাকাতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত আয়নার কিছু অংশে চেহারার কিছু অংশ দেখতে পান তিনি। কিন্তু মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হন। অন্ধকার রাতে বারান্দায় জ্বালানো লাইট থেকে যা আলো আসে, তাতে আয়নায় ভালোমতো মুখ দেখা যায় না। বেশ কসরত করে অবশেষে একটু ভালোভাবে চেহারাটা দেখেই তিনি তৃপ্তিবোধ করেন।

'জানো, তোমার কাঁধে মাথা রেখে আমার ঘুমাতে ইচ্ছে করছে।' টেলিফোনের ওপাশ থেকে আদুরে গলায় বলে মেয়েটা।

মফিজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে কোলবালিশের দিকে হাত বাড়ান। কিন্তু যথাস্থানে সেটা না পেয়ে আবার বিরক্ত হন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষে দেখতে পান বালিশটা নিচে পড়ে আছে। আবার উপুড় হয়ে তিনি এক হাত দিয়ে কৌশলে বালিশটা তুলে ফেলেন

বিছানায়। নিজেও সোজা হয়ে বসেন। তারপর সেটা নিজের কাঁধের সঙ্গে ঠেকিয়ে পুলকিত চোখে কোলবালিশটার দিকে তাকান। কিছুটা আদর করার ভঙ্গিতে হাত দিয়ে ধরে রাখেন কোলবালিশটাকে।

মফিজ সাহেবের খোলা দরজা দিয়ে সেলিম নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে। আধো অন্ধকারেও সে দেখে, তার বাবা রিসিভার কানের সঙ্গে ঠেকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কোনো কিছু দেখতে না পেয়ে বাবার ঘরের দেয়ালঘড়ির দিকে তাকায়। রেডিয়াম দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই অস্থির হয়ে যায় সে।

'তুমি ইদানীং খুব দুষ্টুও হয়েছ।'

দুষ্টু দুষ্টু হাসিতে মুখটা ভরে ফেলেন মফিজ সাহেব। পা দুটো আরো গুটিয়ে তিনি আরো আরাম করে বসেন। কোলবালিশটা কোলের ওপর নিয়ে তাতে হাত ঠেস দিয়ে বসেন।

'অ্যাই, একটু আদর করে কথা বলো না তুমি!' মেয়েটা কিছুটা চিৎকার করে বলে ওপাশ থেকে।

ভীষণ লজ্জা পান যেন মফিজ সাহেব। বাঁ হাতের একটা আঙুল মুখের ভেতর দিয়ে কামড়াতে থাকেন তিনি।

'কী, কথা বলছ না কেন, বাবার ঘর থেকে টেলিফোনটা লুকিয়ে তোমার ঘরে আনতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

চোখ দুটো এবার বড় বড় হয়ে যায় মফিজ সাহেবের। তিনি বিরক্তভরা চোখে রিসিভারটার দিকে তাকান। মুখটা কুঁচকে ফেলেন রাগে।

'তুমি না বললে, কী একটা জরুরি কথা বলবে তুমি, বলো না লক্ষ্মীটি।'

মফিজ সাহেবের চোখ আরো বড় বড় হয়ে যায়। মুখটা আরো বাঁকা করে ফেলেন তিনি। সেলিম নিজের মাথার চুল টানতে থাকে রাগে।

'আহ্, কথা বলছ না কেন সেলিম?'

শিরদাঁড়া সোজা করে বসেন এবার মফিজ সাহেব। খুক-খুক করে সামান্য কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেন তিনি। তারপর কিছুটা শান্ত স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'আম্মাজান, আমি সেলিম না, সেলিমের আব্বা!'

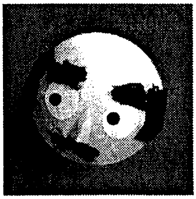

করাত দিয়ে কাঠ কাটার শব্দ আসছে সেলিমের ঘর থেকে। মফিজ সাহেব এবং ছালেহা বেগম আসলে বুঝতে পারছিলেন না, শব্দটা আসছে কোথা থেকে। তাদের ঘরে থেকেই কিছুক্ষণ চুপ মেরে শব্দটার উৎস বের করার চেষ্টা করেন দুজন। কিন্তু কোনো কিনারা খুঁজে না পেয়ে তারা বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। বারান্দায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারেন, শব্দটা আসছে সেলিমের ঘর থেকে। দ্রুত দুজন প্রায় দৌড়ে ঢোকেন সেলিমের ঘরে।

ঘরের ভেতর ঢুকেই থমকে দাঁড়ান দুজন। একটা করাত হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেলিম। সে তার ডবল খাটের মাঝখানটা কাটার চেষ্টা করছে। কষ্টে মফিজ সাহেবের পা দুটো ভারি হয়ে যায়, তিনি আস্তে আস্তে পা ফেলে সেলিমের দিকে এগিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে বলেন, 'এইটা কী করিতেছ বাবা?'

'খাটটা কেটে দু'ভাগ করছি।'

ছালেহা বেগম প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এসে বলেন, 'কেন?'

'দুজন থাকার এই এত বড় খাটে একা একা আর ভালো লাগে না মা!'

মফিজ সাহেব আর ছালেহা বেগম এমনভাবে মুখোমুখি তাকান, যেন তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ। মফিজ সাহেব কিছু একটা বলার জন্য আরো একটু এগিয়ে আসেন, কিন্তু তার আগেই সেলিম বলে, 'দমটা বন্ধ হয়ে আসে আব্বা।'

'কেন, বুকে কোনো অসুখ করিয়াছে বাবা?'

'না আব্বা।'

'তাহা হইলে?'

'মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন নেই!'

'কী নাই?'

'জানি না।'

'কোথায় নাই?'

'বুকে।'

'একটা ডাক্তার ডাকিয়া আনি বাবা?' কথাটা বলেই নিজের জিভ নিজেই কামড়ান মফিজ সাহেব। ডাক্তার আনার খরচের কথা মনে পড়ে যায় তার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, 'না থাক, আমি বরং তোমার জন্য দোকান হইতে ঔষধ কিনিয়া আনি। তা বাবা, তুমি কী ঔষধ খাইবা—অ্যালোপ্যাতি না হোমিওপ্যাতি।' কেউ কিছু বলার আগেই

মফিজ সাহেব আবার বলেন, 'হোমিওপ্যাতিই ভালো। মিষ্টি মিষ্টি লাগিবে, আবার সুস্বাদুও।'

'আবার দামও কম।' সেলিম গম্ভীরভাবে কথাটা বলে খাটটা পুনরায় কাটার জন্য প্রস্তুতি নেয়। মফিজ সাহেব দ্রুত এগিয়ে এসে সেলিমের হাতের করাতটা চেপে ধরে বলে, 'এটা কাটিয়ো না বাবা, কাটিলে মনে হইবে আমার বুক কাটিয়াছ, একেবারে মাঝ বরাবর কাটিয়াছ।'

'কাটব না তো কী করব?' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সেলিম কিছুটা রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতার মতো, কিছুটা আবৃত্তির ঢঙে বলে, 'আমি শোয়ার পরও আমার খাটের পাশে যে শূন্য জায়গা থাকে, সে শূন্য জায়গাটা দেখে এক অসীম শূন্যতায় আমার সারা রাত কেটে যায়। নিশিজাগা পাখির মতো আমার মন গুমরে গুমরে কাঁদে। এক বিশাল হাহাকার বুকের মাঝে দাপিয়ে দাপিয়ে মরে। আমি কোথায় যেন হারিয়ে যাই, আমার দেহ-মন-অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এক না-পাওয়া বেদনায়।' সেলিম একটু থেমে ব্যথা ব্যথা গলায় বলে, 'বাবা, একা একা এই খাটটা কাটতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে, তুমি কি একটু সাহায্য করবে প্লিজ?'

মফিজ সাহেব সেলিমের হাত থেকে করাত কেড়ে নিয়ে আগের মতোই আস্তে আস্তে বলেন, 'না বাবা, খাটটা কাটিয়া কোনো কাজ নাই। আমাদের কাজের ছেলে আবুলের সিঙ্গেল খাটের মতো চকিটা তোমার ঘরে আনিয়া দিতেছি আমি। আশা রাখি তোমার আর কোনো কষ্ট হইবে না। তাই না বাবা?'

করাতটা হাতে নিয়ে মফিজ সাহেব বের হয়ে যান সেলিমের ঘর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ছালেহা বেগমও বের হয়ে আসেন। সেলিম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে খাটের ওপর।

মামা সেই সকালবেলা কোথায় যেন গিয়েছিলেন, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সেলিমের ঘরে ঢুকেই তিনি চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলেন। সেলিম মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে কী যেন ভাবছে গভীরভাবে। মুখটা কালো হয়ে গেছে তার। মামা দ্রুত সেলিমের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, 'কিরে, রেলগাড়ির নিচে চাপা পড়েছিলি নাকি!'

মাথা থেকে হাত সরিয়ে মুখটা আরো কালো করে সেলিম বলে, 'না।'

'তাহলে চেহারাটা এমন বানিয়ে রেখেছিস কেন?'

'ওর বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আর আমি এদিকে কিছুই করতে পারছি না।'

মামা সেলিমের পাশে বসে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'আমি যে একটা বুদ্ধি দিলাম?'

'তোমার বুদ্ধিমতো খাটটা কাটছিলাম, কিন্তু খাট কাটার শব্দ শুনেই বাবা দৌড়ে ঘরে ঢুকে করাতটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল।'

'তাহলে তো খালি খালি করাত কেনার টাকাটাই লস হলো।'

'হ্যাঁ। অতি সত্বর কিছু টাকা ম্যানেজ করতে হবে মামা।'

'তা না হয় করলাম। কিন্তু সেদিন তোর জন্য কাজ করতে গিয়ে কী মারটাই না খেলাম। বুবু মনে করেছে আমি চম্পার সঙ্গে ইয়ে করছি। মাথাটা এখনো ফুলে আছে রে, একটু পরপরই চিড়িক দিয়ে ব্যথা করে।'

'তুমি আসলে সেদিন ভুল করেছ মামা, কোন কথা বললে মেয়েরা খুশি হয়, তা জানা আসলে মুশকিল।'

'আমিও একটু ইয়ে হয়ে গিয়েছিলাম!'

'মামা, তুমি নাকি সেদিন মিতুর হাতও ধরতে চেয়েছিলে!'

'আসলে তোরা কেউই বুঝলি না রে!' মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'সবকিছু সাধারণভাবে দেখতে নেই রে!'

মামা কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবেন। হঠাৎ কিছুটা চিৎকার করে সেলিমকে কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে কী যেন বলেন তিনি। কথাটা শুনেই বেশ লাজ লাজ ভঙ্গিতে সেলিম বলে, 'তুমি এসব কী বলছ মামা!'

'কী বলছি মানে?' মামা কিছুটা রাগ করার ভান করে বলেন, 'প্রেয়সীর জন্য অনেক রাজা-বাদশা সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, অনেকে দিয়েছেন আত্মবলি, অনেকে হারিয়ে গেছেন গভীর অরণ্যে, আর তুই মাত্র নিজেদের ঘরের জিনিস চুরি করতে পারবি না!' মামা সেলিমের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলেন, 'নিজেদের ঘরের জিনিসই তো, অন্যের ঘরের তো না। না না, তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে সেলিম বলে, 'মামা, তুমি এত হতাশ হচ্ছে কেন বলো তো, হবে, দেখো মামা, সব হবে।'

'তাহলে আরেকটা কথা শোন।' মামা সেলিমকে আবারও কাছে টেনে নেন, আবারও কানে কানে কী যেন বলেন। শেষে শব্দ করে বলেন, 'তাহলে শুরু করা যাক, কী বলিস?'

'শুরু করব? পরে কেউ আমাকে চোর আর আমার বউকে চোরের বউ বলবে না তো মামা?'

'এ কথা কেন বলবে?'

'চুরি করছি আর বলবে না! আমাকে চোর বললে না হয় সহ্য করতে পারব, কিন্তু আমার বউকে দেখে রাস্তার লোকজন যদি বলে চোরের বউ টু...উ...উ..., চোরের বউ...টু...টু... তাহলে?'

'না, বলবে না। বললে তো দেশের অনেকের বউকেই চোরের বউ বলে ডাকত। তা ছাড়া তুই কখনো কোনো ঘুষখোরের স্ত্রীকে ঘুষখোরের বউ বলে ডাকতে শুনেছিস?'

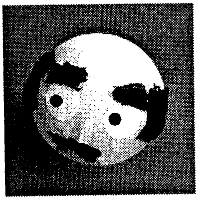

'তোমার কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করি না, গরু কোথাকার!' মিতু রাগ করে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে।

চারপাশের সবুজ ঘাস থেকে একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দেয় সেলিম। ঘাসটা কামড়াতে কামড়াতে মিতুর দিকে ঘুরে বসে বলে, 'তুমি কেন বুঝতে পারছ না লক্ষ্মীটি...।'

মিতু সরাসরি চোখ তুলে তাকায় সেলিমের দিকে। সেলিম আগের মতোই ঘাস চিবোচ্ছে। তা দেখে মিতু কিছুটা চিৎকার করে বলে, 'গরুর মতো ঘাস চিবোচ্ছ কেন?'

'তুমি না একটু আগেই আমাকে গরু বললে, তাই ঘাস খাচ্ছি।'

'ইয়ার্কি কোরো না, আজ তোমার কপালে শনি আছে।'

'শনি কপালে থাকলে কী হয় মিতু?'

'আবার ইয়ার্কি! আগে বলো, তুমি কাল রাতে ফোনটা নিজের ঘরে নিতে পারলে না কেন?'

'আমি তো তোমাকে আগেই বললাম, আমি বাবার ঘরে যাওয়ার আগেই তুমি ফোন করেছ?'

'তোমার যাওয়ার কথা ছিল কখন?'

'ঠিক দুটোয়।'

'আমি তো ঠিক দুটোতেই ফোন করেছি।'

'আহা, কথাটা আবার বলতে হচ্ছে, বসে থাকতে থাকতে একটু ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আমি।'

'যত ঘুম তোমার চোখে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ মিতু।'

'চুপ করো।' হাত ঝাঁকিয়ে ধমকটা দিতেই মিতুর হাত থেকে হাতব্যাগটা ছুটে যায় সেলিমের দিকে। ব্যাগের লোহার লকটা কপালে লাগতেই সে আহ্ করে শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে মিতু বলে, 'কী হলো?'

কপালটা হাতাতে হাতাতে সেলিম বলে, 'একটু আগে বললে না আজ আমার কপালে শনি আছে?' সেলিম মিতুর একটা হাত ধরে তার কপালের ফুলে যাওয়া জায়গাটার ওপর রেখে বলে, 'দেখো, সত্যি সত্যি শনিটা কী সুন্দরভাবে কপালের ওপর ফুলে উঠেছে!'

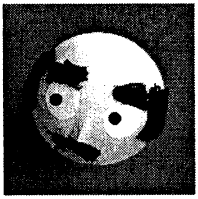

মাথায় লম্বা লম্বা জট, কালো আলখেল্লা আর হাতে অনেকগুলো তামার চুড়ি পরা একটা লোক বসে আছে ড্রইংরুমে। লোকটার পাশে একটা কাপড়ের পোঁটলা পড়ে আছে। একটা অদ্ভুত ধরনের বাঁশের লাঠি এক হাত দিয়ে চেপে ধরে লোকটা চোখ দুটো বুজে কী যেন ভাবছে আর একটু পরপর বিড়বিড় করছে। দূর থেকে দেখে মনে হবে, গভীর ধ্যানে মগ্ন তিনি।

লোকটির সামনে গদগদ ভঙ্গি নিয়ে বসে আছেন ছালেহা বেগম আর মফিজ সাহেব। প্রচণ্ড বিশ্বাসী-চোখে তারা তাকিয়ে আছেন তার দিকে। কিছুক্ষণ পর ছালেহা বেগম ভয় ভয় গলায় বলেন, 'কবিরাজ বাবা, আমি আপনাকে অনেক কষ্ট করে খুঁজে বের করেছি, ওনার ওপর জিন ভর করেছে।'

'একদিন ধাক্কা দিয়া ফালাইয়াও দিয়াছে আমাকে।' মফিজ সাহেব মুখটা বিকৃত করে বলেন।

'পেটের অবস্থা কেমন?' গম্ভীর স্বরে আগের মতোই চোখ বন্ধ করে বলেন কবিরাজ বাবা।

'মাশাল্লাহ ভালো, খুবই ভালো।' মফিজ সাহেব হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এই দেখেন, ছোট ছোট জামা পরি, পেটটা খালি রাখি। এতে অনেকগুলি উপকার। ছোট জামা ধুইতে সাবান কম খরচ হয়, আবার বাতাসে সরাসরি অক্সিজেন আসিয়া ধাক্কা খায় পেটের সঙ্গে, এতে পেটও ভালো থাকে। আবার দেখেন বুকটা আমি ঢাকিয়া রাখিয়াছি।' বসতে বসতে মফিজ সাহেব বলেন, 'কারণ বুকে ঠাণ্ডা লাগিলে অনেক অসুখ হয়, হার্ট অ্যাটাকও হয়। আপনি কি কখনো শুনিয়াছেন, কাহারও কখনো পেট অ্যাটাক হইয়াছে? সুতরাং পেট খালি রাখিলে কোনো ক্ষতি নাই, শুধুই লাভ!'

কবিরাজ বাবা একবার চোখ দুটো খুলে মফিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে আবার বন্ধ করে বলেন, 'মুখের সবগুলো দাঁতই ঠিক আছে তো?'

ছালেহা বেগম ঘোমটা আরো একটু টেনে নিয়ে বলেন, 'মাড়ির অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেছে ওনার। এখন তো কয়লা কিংবা ছাই পাওয়া যায় না। দাঁত মাজার জন্য টুথপেস্ট কিংবা পাউডার কিনতে টাকা খরচ হবে বলে প্রায়ই তিনি দাঁত মাজেন না। আমরা অবশ্য চুপি চুপি টুথপেস্ট কিনে দাঁত মাজি।'

'মিথ্যা কথা কবিরাজ বাবা, মিথ্যা কথা। আপনি জানেন তো, ঘষিলে সব জিনিস ক্ষয় হইয়া যায়, দাঁত ঘষিলে দাঁতও ক্ষয় হয়, তাই আমি ওগুলি ঘষি না। আপনি কি

কখনো কোনো কুকুরকে দাঁত মাজিতে দেখিয়াছেন? তবুও দেখিবেন, ওদের দাঁতগুলি কত পরিষ্কার আর মজবুত।'

'ঠিকমতো গোসল-টোসল করেন তো?' কবিরাজ বাবা এবার চোখ বুজেই কথাটা বলেন।

'উনি মনে করেন গোসল করা মানেই ট্যাঙ্কির পানি খরচ। আবার গোসল করে গামছা দিয়ে গা মুছলে নাকি গামছা ক্ষয় হয়ে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়, তাই... ।'

ছালেহা বেগমের কথাটা কেড়ে নিয়ে মফিজ সাহেব কিছুটা রাগী রাগী গলায় বলেন, 'বাবা, এটাও মিথ্যা কথা। হাতি এত বড় প্রাণী, সেও বছরে মাত্র একবার-দুইবার গোসল করে। আর মানুষরা তো ছোটখাটো প্রাণী, তাই সারা জীবন গোসল করিলেই কী, না করিলেই কী। কথাটা ঠিক বলিয়াছি না কবিরাজ বাবা?'

ছালেহা বেগম এবার রেগে গিয়ে বলেন, 'ওনার একটা বদভ্যাস আছে কবিরাজ বাবা, আরেকটা বিয়ে... ।'

হাত দিয়ে ইশারা করে ছালেহা বেগমকে থামিয়ে দিয়ে কবিরাজ বাবা বলেন, 'আমি জানি, এ সবই জিনের কাজ।'

পাটের একটা ছালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে এ সময় সেলিম বলে, 'কবিরাজ বাবা, কোনো লোককে বদজিন ধরলে নাকি সে তার ছেলেকে বিয়ে না করিয়ে নিজেই বিয়ে করতে চায়?'

'হ্যাঁ, এ রকম হতে পারে।' চোখ দুটো খুলে সেলিমের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরমুখে বলেন কবিরাজ বাবা।

'সেই বদজিন তাড়াতে সেই লোকটিকে একটা ছালায় ভরে তিন ঘণ্টা বাঁশের কাঁচা কঞ্চি দিয়ে পেটালে নাকি সব ঠিক হয়ে যায়, বদজিন সুড়সুড় করে চলে যায়?'

'হ্যাঁ, আমি এই চিকিৎসাই ভাবছি।'

'কবিরাজ বাবা।' সেলিম ছালাটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কবিরাজ বাবার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'আমি এই ছালাটা এই জন্যই নিয়ে এসেছি বাবা।' ডান হাতে ছালা ধরে বাঁ হাত পেছন থেকে বের করে মফিজ সাহেবের দিকে বিশেষ ভঙ্গিমায় তাকায় সেলিম, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'আমি একটা কঞ্চিও এনেছি কবিরাজ বাবা।'

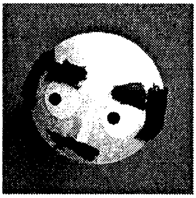

মামা ফিসফিস করে বললেন, 'এই সেলিম, ওঠ, কাজটা করতে হবে না?'

ঘুমজড়িত কণ্ঠে সেলিম বলল, 'এখন কয়টা বাজে মামা?'

'রাত প্রায় দুটা।'

'একটু পরে উঠি?'

'না, এখনই ওঠ।'

'আর একটু ঘুমাই না মামা।'

'না, রাত দুটা, এখনই উত্তম সময়।'

আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসে সেলিম। হাত দুটো টানটান করে মামাকে বলে, 'একটু ভয় ভয় করছে মামা।'

'প্রথম দিন দুলাভাইয়ের ঘরে যে গিয়েছিলি, সেদিন কি ভয় লেগেছিল?'

'না।'

'তাহলে আজ লাগছে কেন?'

'চুরির ব্যাপার তো!'

'অত ভয় পেতে হবে না, যা রেডি হ।' মামা একটা লম্বা কালো কাপড় এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এই নে, মাথাটা সম্পূর্ণ পেঁচিয়ে শুধু চোখ দুটো বের করে ঘরে ঢুকবি। দেখিস কারো সঙ্গে গুঁতোটুতো খেয়ে পড়ে যাস না যেন।'

'যদি ধরা পড়ে যাই মামা?'

'আগে ধরা পড়, তারপর দেখা যাবে।'

'বিয়ের জন্য এত কিছু করতে হচ্ছে?'

'এটা তো কেবল শুরু, বিয়ে কর; তারপর আরো কত কি করতে হবে!'

'বুকটা ধুকধুক করছে মামা।'

'যা, ঠিক হয়ে যাবে। বিসমিল্লাহ বলে কাজটা শুরু করবি কিন্তু।'

'সাধারণত ভালো কোনো কাজ করার আগে বিসমিল্লাহ বলতে হয়, কিন্তু চুরি করার আগে কি বিসমিল্লাহ বলা ঠিক হবে?'

'তুই চুরি করছিস, এটা তোকে কে বলল! তুই তো বিয়ের মতো একটা মহৎ কাজ সম্পাদনের জন্য কিছুটা প্রস্তুতি নিচ্ছিস।'

সেলিম মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'ঠিক ঠিক।'

কালো কাপড়টা দিয়ে মাথাটা সম্পূর্ণ বেঁধে শুধু চোখ দুটো বের করে মামার দিকে তাকাল সেলিম। মামা তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল উঁচু করে মুচকি হেসে বলল, 'গ্রেট! এবার যা।'

সেলিম দু'পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মামা বলল, 'থামলি কেন, যা!'

'কোনো একটা দোয়া পড়ে একটু ফুঁ দিয়ে দাও না মামা।'

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে গিয়েই মামা থেমে যান। সেলিম তা দেখে বলে, 'থামলে কেন?'

'দোয়া-দরুদ সব ভুলে গেছি রে!'

'কালকেও না তুমি কী একটা দোয়া পড়লে।'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে সব ভুলে গেছি রে!' মামা সেলিমের পিঠে একটা মৃদু থাপ্পড় দিয়ে বলেন, 'যা যা, দোয়া লাগবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পা টিপে টিপে সেলিম মফিজ সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। আধা-ভেড়ানো দরজাটার কপাটগুলো আরো একটু ফাঁক করে সে পা রাখে ঘরের ভেতর। মফিজ সাহেব কোলবালিশটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছেন, পাশে ছালেহা বেগম ঘুমিয়ে আছেন অন্যদিকে কাত হয়ে। মফিজ সাহেবের মাথার কাছের টেবিলঘড়িটা দেখেই চোখ দুটো চকচক করে ওঠে সেলিমের। আজকের টার্গেট ওই ঘড়িটা।

খুব নিঃশব্দে পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যায় সেলিম। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই মফিজ সাহেব মোচড় দিয়ে সেলিমের দিকে পাশ-ফিরে শোন। সেলিম একটু থমকে দাঁড়ায়। বারান্দায় লাইটের আলো ভেন্টিলেটর দিয়ে মফিজ সাহেবের মাথার কাছে এসে বেশ আলো করে ফেলেছে জায়গাটা। একটু পর সেলিম আবার নিঃশব্দে পা ফেলে। মফিজ সাহেবের ঠিক সামনে গিয়ে ঘড়িটার দিকে হাত বাড়াতেই তিনি বলেন, 'যা যা, চলে যা।'

বুকের ভেতর ধক্ করে ওঠে সেলিমের। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ে সে। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে তার বাবার দিকে। মফিজ সাহেবের মুখে মৃদু মৃদু হাসি, কিন্তু তার চোখ দুটো বন্ধ।

সেলিম আরো একটু এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই মফিজ সাহেব আবার বলেন, 'তোকে না বললাম, চলে যা!'

এগিয়ে দেওয়া পা'টা পিছিয়ে আনে সেলিম। চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আগের মতোই। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আর কোনো কথা শুনতে না পেয়ে সে আবার এগিয়ে যায়। এবার একটু শব্দ করে মফিজ সাহেব বলেন, 'আমার কথা না শুনলে কিন্তু ভালো হবে না।'

চোখ দুটো ভালোভাবে মেলে সেলিম বাবার দিকে তাকায়। কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করে, কিন্তু বুঝতে পারে না। বাবার চোখ দুটো আগের মতোই বন্ধ। সেলিম মাথায় কাপড়টা আরো একটু ভালোভাবে টেনে নিয়ে এগিয়ে যায় ঘড়ির দিকে। সঙ্গে

সঙ্গে কোলবালিশটা বেশ জোরে চেপে ধরে মফিজ সাহেব বলেন, 'আমার জিনিস কেউ নিয়ে যাবে, এটা আমি সহ্য করব না।'

সেলিম একটু উপুড় হয়ে মফিজ সাহেবের মুখের কাছে নিজের মুখটা আনে। মফিজ সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। সেলিমের চোখ দুটো হেসে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। সে বুঝতে পারে ঘুমের ঘোরে কথা বলছেন মফিজ সাহেব এবং এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বাবার মুখের সামনে হাত বাড়িয়ে নিশ্চিত হয়, বাবা আসলেই ঘুমাচ্ছেন। হাতটা মফিজ সাহেবের মুখের কাছ থেকে ঘড়ির দিকে বাড়াতেই সে আবার চমকে ওঠে। চেপে ধরা কোলবালিশটা আরো একটু বুকের কাছে এনে তার ওপর পা তুলে দেন মফিজ সাহেব।

হাতটা আবার বাড়িয়ে দেয় সেলিম এবং কোনো রকম শব্দ না করে ঘড়িটা তুলে আনে সে নিজের হাতে। বুকের ভেতর ধুকধুক শব্দ হচ্ছে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে শব্দগুলো, যতটুকু নিঃশব্দে সেলিম ঘড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, তার চেয়েও বেশি নিঃশব্দে পিছিয়ে আসতে লাগল সে। বুকের সঙ্গে ঘড়িটা চেপে ধরে মেঝের মাঝখানে আসতেই কী করে যেন হঠাৎ ক্রিং ক্রিং বেজে উঠল ঘড়ির অ্যালার্ম। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠেন মফিজ সাহেব। ঘড়িটা নিয়ে সেলিম দৌড়ে বের হয়ে আসতেই আবার ফিরে গিয়ে মেঝের ওপর রেখে দেয় ঘড়িটা, তারপর টুক করে বেরিয়ে আসে মফিজ সাহেবের ঘর থেকে।

ঘড়িটা বাজছেই।

চিৎকার করতে করতে রান্নাঘরে ঢুকেই প্রমা ছালেহা বেগমকে বলে, 'মা, আমার গলার সোনার চেইনটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কোথায় রেখেছিলি?'

'রাতে ঘুমানোর সময় খুলে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম।'

'রাতে কি জানালা খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ, ওপরের পাট খোলা ছিল।'

'জানালার ওপর দিক থেকে পরিচিত কেউ ছাড়া সহজে চেইনটা টেবিল থেকে তুলে নিতে পারবে না, খুঁজে দেখ, কোথাও আছে বোধহয়।'

'সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও পেলাম না। একেবারে গায়েব হয়ে গেছে সোনার চেইনটা। '

রান্নাঘরের দিকে আসতেই প্রমার কথাটা শুনে ফেলে সেলিম। থমকে দাঁড়ায় সে, চোখ দুটো বিশেষ ভঙ্গিমা করে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকেই পা টিপে টিপে আবার ফিরে যায়।

'আম্মা, আমি শুনছি চোরেরা নাকি সোনা আর দামি দামি জিনিস খুব পছন্দ করে।' চম্পা ছালেহা বেগমের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাইল রাইতে চাচাজানের ঘর থাইক্যাও ঘড়ি নিতে আইছিল। ভাগ্যডা ভালো, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে ঘুম থেইকা ওঠার জন্য ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়া রাখছিলেন, আর চাচাজান যে চিরিৎকার দিছিল, তাই ঘড়িটা নিতে পারে নাই।'

'তুই চুপ কর।' চম্পার দিকে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে প্রমা বলে, 'আমার কিন্তু অন্য কিছু মনে হচ্ছে মা। আমার মনে হচ্ছে...।' প্রমা কথাটা না বলে থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চম্পা বলে, 'কী মনে হইতেছে আপা?'

'ওই ছেমড়ি, তোর এত আগ্রহ কেন?'

'এমনি।' চম্পা কিছুটা থতমত খেয়ে ঢোক গিলে বলে, 'এমনি আপা। আপনি তো জানেন আপা, সোনার জিনিস আমি তেমন লাইক করি না, তাই পরিও না।' চম্পা একটু থেমে আবার গম্ভীর হয়ে বলে, 'কোনো জিনিস জানার আগ্রহ থাকা খুব খারাপ, না আপা? মামা কইছে, যত জিনিস জানা যায়, তত নাকি জ্ঞানী হওয়া যায়।'

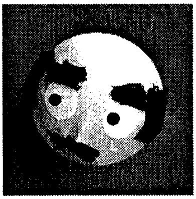

হাসতে হাসতে বাসার ভেতর ঢুকছে মামা আর সেলিম। সেলিমের হাতে একটা কারুকাজ করা মাটির ব্যাংক। চম্পা সেটা দেখেই কিছুটা দৌড়ে এসে বলল, 'ভাইজান, এটা কী জন্য?'

'টাকা জমাব এর ভেতর, অনেক টাকা।'

'খুবই ভালো কথা, আমি তাইলে এই ব্যাংকটা নিজ হাতে পরিষ্কার করমু প্রতিদিন।'

'ঠিক আছে।'

ঘরে ঢুকেই ওয়ারড্রবের ওপর ব্যাংকটা রেখে দেয় সেলিম। মামা খাটের ওপর বসেই বলেন, 'ব্যাংকটা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলে কেমন হয়?'

'খুবই ভালো হয়, একটা মিলাদও দেয়া যায় মামা।'

'না না, মিলাদ-টিলাদ দরকার নেই, শুধু উদ্বোধন করলেই চলবে।'

'উদ্বোধনটা করবে কে মামা?'

'কেন, আমি!'

'বড় সুন্দর।'

'আচ্ছা লাল ফিতা-টিতা আছে নাকি বাসায়?'

'প্রমার ঘরে আছে বোধহয়।'

'নিয়ে আয়।'

সেলিম ঘর থেকে বের হতেই মামা আবার ডাক দেয়, 'আজকের আয় কত হলো রে, আমার কাছে দে তো, গুনে দেখি।'

প্যান্টের ভেতরের পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে সেলিম মামার হাতে দেয়। মামা টাকাগুলো গুনতে থাকেন। সেলিম ঘর থেকে বের হয়ে প্রমার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই মামা একশ টাকার একটা নোট টুক করে নিজের পকেটে রেখে দেন।

কিছুক্ষণ পর সেলিম ঘরে ঢুকেই বলে, 'মামা, ঠিক লাল ফিতা পেলাম না, একটু গোলাপি গোলাপি।'

মামা টাকাগুলো থেকে চোখ তুলে সেলিমের হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ওতেই হবে।'

'এখন কী করব মামা?'

'ব্যাংকটা মেঝেতে রেখে তুই ফিতার সামনে দাঁড়িয়ে এক দিক টেনে ধরবি, আমি আরেক দিকে টেনে ধরব, তারপর ফিতাটা খ্যাচ করে কেটে ব্যাংকটা উদ্বোধন করব।'

'কাটবে কী দিয়ে?'
'কেন, কাঁচি দিয়ে।'
'কাঁচি তো নেই বোধহয়।'
মামা কী যেন ভাবেন একটু, তারপর বলেন, 'চম্পাকে বঁটি আনতে বল।
সেলিম ঘর থেকে বের না হয়ে চিৎকার করে চম্পাকে বঁটি আনতে বলে। চম্পা থপ থপ করে পা ফেলে বঁটিসহ চলে আসে সেলিমের ঘরে। মামা চম্পার হাত থেকে বঁটিটা নিয়ে বলেন, 'গুড।'
'বঁটি দিয়া কী অইব মামা?' মামার হাতে বঁটিটা দিতে দিতে চম্পা বলে।
'জরুরি একটা কাজ আছে চম্পা, খুব জরুরি।'
'আমি চইল্যা যামু, না খুব জরুরি কাজে থাকমু?'
মামা একটু ভেবে বলেন, 'আপাতত যেয়ো না, তোমাকে প্রয়োজন আছে।'
'মামা, আমি মাথাডা একটু আঁচড়াইয়া আসমু?'
চম্পার দিকে মামা গভীরভাবে তাকিয়ে বলেন, 'না, ঠিক আছে।'
'কপালে একটা ফোঁটা দিয়া আসি মামা?'
'না, তারও দরকার নেই।'
'ফটো তুলবেন না মামা?'
'না, আপাতত ফটো না তুললেও চলবে।' মামা গোলাপি রঙের ফিতাটা চম্পার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুমি এ ফিতাটার এক দিকে ধরবে, সেলিম ধরবে আরেক দিকে।' মামা চম্পাকে একটু বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক এইভাবে টানটান করে ধরবে। আমি ফিতাটা কাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা হাততালি দেবে, ওকে?'
'মামা, হাততালি দেওয়ার সময় ফিতাডা তো হাত থাইক্যা পইড়্যা যাইব।'
'যাক।'
সেলিম ফিতার এক দিকে, চম্পা আরেক দিক টেনে ধরতেই মামা কাটতে শুরু করেন। কিন্তু দু-তিন ঘষা দেওয়ার পরও ফিতা না কাটায় মামা বলেন, 'ধ্যাত, কাটে না কেন?'
চম্পা বঁটির দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে বলে, 'মামা, বঁডিডা তো আপনি উল্টা ধরছেন।'
মামাও বঁটিটার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে বলেন, 'ও ইয়েস।'
মামা বঁটিটা ঠিকমতো ধরে ফিতাটায় এক ঘষা দিতেই কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মামা বললেন, 'হাততালি।'
সেলিম আর চম্পা বেশ শব্দ করে হাততালি দিচ্ছে। মামা একটা একটা করে টাকার নোট ব্যাংকের ভেতর ঢোকাচ্ছেন। টাকাগুলোর দিকে আদুরে চোখে তাকিয়ে চম্পা বলে, 'মামা, কত টাকায় হাজার টাকা হয়?'
'গাধা, এক হাজার টাকায় হাজার টাকা হয়।'
'থ্যাংকু মামা, আমার খুব শখ হাজার টাকা জমাইয়া আমি একদিন সৌদি আরব যামুগা। সৌদি আরবে নাকি অনেক টাকা!'

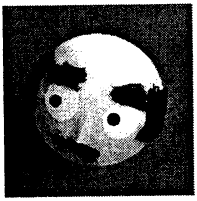

সম্পূর্ণ খালি গায়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন মফিজ সাহেব। তার পিঠে বেশ কয়েকটা দাগ, নীল হয়ে ফুলে আছে জায়গাগুলো। কাঁচা কঞ্চির আঘাতে কান্না কান্না মুখ করে কোঁকাচ্ছেন মফিজ সাহেব। ছালেহা বেগম একটা তেলের বোতল হাতে নিয়ে বসে আছেন তার পাশে।

'শরীরের কোথায় কোথায় বেশি ব্যথা, বলেন, তেল মালিশ করে দেই।' ছালেহা বেগম তেলের বোতলের ঢাকনা খুলতে খুলতে মফিজ সাহেবকে বললেন।

'তৈল মালিশ করিবা? না করিলে হয় না?'

'ব্যথায় চিল্লাচ্ছেন, আর বলছেন তেল মালিশ না করলে হয় না। মরণ!'

'কঞ্চি দিয়া এমনভাবে পিটুনি দিয়াছে, ব্যথা তো হইবেই সেলিমের মা।'

'সে জন্যই তো তেল মালিশ করতে চাইছি।'

'তৈল মালিশ করিবা করো...।' মফিজ সাহেব হঠাৎ ছালেহা বেগমের হাত চেপে ধরে বলেন, 'তবে তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, বেশি তৈল খরচ করিবা না। তোমার পায়ে পড়ি, অল্প অল্প করিয়া তৈল মাখিবা গায়ে।'

'আপনি চুপ করেন তো!'

'বউ, জিন যদি আজ রাত্রিতেও আসে?'

'কালকেও তাহলে আবার কঞ্চি দিয়ে পেটাতে হবে আপনাকে।'

'বলো কি!'

'আপনি সোজা হয়ে শোন তো!'

'জিন তো ছেলে, তাই না সেলিমের মা?'

'হ্যাঁ, মেয়ে হলো পরী।'

'আমাকে পরী ধরিলে না হয় কথা ছিল।'

'আপনার বদচিন্তা আর গেল না!' ছালেহা বেগম গজরাতে গজরাতে বলেন, 'ওষুধ খাওয়ার সময় হইছে, বোতল থেকে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছি।'

কথাটা বলেই ছালেহা বেগম ওষুধ আনার জন্য উঠে দাঁড়ান, সঙ্গে সঙ্গে মফিজ সাহেব তাকে খামচে ধরে বলেন, 'করো কী করো কী! তোমার হাতে প্রচুর তৈল লাগিয়া আছে।' মফিজ সাহেব হাসি হাসি মুখ করে ছালেহা বেগমের একটা হাত নিজের দিকে এগিয়ে এনে বলেন, 'যাও না, কাহাকেও দিয়া আটা মাখাইয়া সেই আটার মধ্যে তোমার

তৈল-চুবচুবে ভেজা হাতটা ভালোভাবে ঘষিয়া একটা পরোটা ভাজিয়া আনো না। তৈলটা নষ্ট করিয়া কী লাভ, বলো?'

'মরণ! কঞ্জুসগিরির একটা সীমা আছে!'

কাচের গেলাসে বোতল থেকে ওষুধ ঢেলে এনে ছালেহা বেগম মফিজ সাহেবের কাছে আসতেই তিনি চমকে উঠে গেলাসের দিকে তাকালেন, 'এটা তুমি কী করিলা সেলিমের মা, এত ঔষধ ঢালিয়াছ কেন!'

'ডাক্তার তো এতটুকু করেই খেতে বলেছেন।'

'বলুক। অর্ধেক ঔষধ বোতলে ঢালিয়া রাখো, তারপর গেলাসে পানি ঢালিয়া গেলাসটা ঔষধের সমান ভরিয়া দাও।' মফিজ সাহেব ছালেহা বেগমের হাত থেকে ওষুধের গেলাসটা হাতে নিয়ে বললেন, 'না থাক, আমি ভরি।'

মফিজ সাহেব খুব সাবধানতার সঙ্গে গেলাস থেকে অর্ধেক ওষুধ বোতলে ঢাললেন, তারপর গেলাসটায় পানি ঢেলে অগের ওষুধের সমান করলেন। গেলাসটা সোজা করে সেদিকে তাকিয়ে বেশ তৃপ্তির হাসি দিয়ে বললেন, 'দেখেছ! কোন বাপের ব্যাটা এখন বলিতে পারিবে আমি ঔষধ কম খাইয়াছি। বুঝিলে সেলিমের মা, ইহাকেই বলে হিসাব।' মফিজ সাহেবের চোখ দুটো হাসিতে চিকচিক করছে, 'এবার গেলাসের সবটুকু ঔষধ আমি খাইয়া ফেলি সেলিমের মা?'

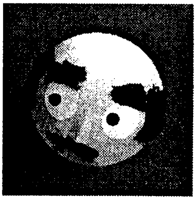

মুচকি হাসতে হাসতে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে ঢোকে সেলিম। অনেকগুলো মানুষ ফোন করার জন্য বসে আছে। বেশ কয়েকটা মেয়েও বসে আছে অধীর আগ্রহে। কোনায় একটা চেয়ার খালি দেখে সেখানে বসল সেলিম। একটু ইতস্তত করে পাশের কয়েকজনকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, আমার একটা জরুরি ফোন করা দরকার। এই এক থেকে দুই মিনিট সময় নেব।'

পাশ থেকে একজন বলল, 'ভাইয়া, কেউ মারা গেছে নাকি আপনার?'

সেলিম কিছুটা বিষণ্নমুখে বলল, 'ঠিক মারা যায়নি, মারা যাওয়ার পথে।'

'মুমূর্ষু ব্যক্তিটি কে?' পাশ থেকে আরেকজন বলল।

আগের চেয়েও দুঃখী দুঃখী গলায় সেলিম বলল, 'আমি নিজেই।'

সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে আগের জন কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'কই আপনি মারা যাচ্ছেন, আপনি তো ঠিকই আছেন।'

'ভাইয়া!' গলাটা অসম্ভব খাদে নামিয়ে কিছুটা তবলিগি ঢঙে সেলিম বলল, 'চোখ বুজলেই কেবল মানুষকে মৃত বলে না। মানুষ আসলে প্রতিদিন মরে, প্রতিদিন জন্মায়।'

তার গলার করুণ স্বর শুনেই হোক বা তার আধ্যাত্মিক কথা শুনেই হোক, পাশের একজন মধ্যবয়সী লোক বললেন, 'আপনি আগে করুন, আপনার যে খুব জরুরি তা বোঝা যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ আপনাকে।' অত্যন্ত গভীরভাবে সেলিম বলল, 'মানুষের দুঃখ-বিপদে এগিয়ে আসা মানুষের কর্তব্য। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আংকেল।'

টেলিফোন সেটটা টেনে নিজের সামনে আনে সেলিম। রিসিভারটা তুলেই বাটনগুলো টিপতে থাকে সে। বেশ কয়েকবার টিপেও লাইন না পেয়ে রিসিভারটা রেখে দেয় আগের জায়গায়। একটু পর আবার চেষ্টা করে, এবারও এনগেজ্‌ড। রিসিভারটা আবার রেখে দেয় সে।

চুপচাপ বসে থেকে কী যেন ভাবতে থাকে সেলিম। একটু পর একা একাই হেসে ফেলে সে। পাশের মধ্যবয়সী লোকটা সেলিমের দিকে তাকালেই যেন শুনতে পান এমন শব্দে বিড়বিড় করে সে বলে, 'মাওলা, মানুষকে তুমি এই হাসাও এই কাঁদাও। তোমার খেল বোঝা বড় মুশকিল!'

রিসিভারটা তুলে আবার বাটন চাপে সেলিম। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে তার। কপালে রিসিভারটা তুলতেই হুবহু মেয়েদের গলার স্বর নকল করে সে বলে, 'সালামালাইকুম আংকেল, আমি মলি...!'

সঙ্গে সঙ্গে ফোনের দোকানের সবাই ফিরে তাকায় সেলিমের দিকে। সেলিম বুঝতে পারে সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সে বিষয়টা পাত্তা না দিয়ে আগের মতোই মেয়েলি গলায় বলল, 'আংকেল, আমাকে চিনতে পারেননি? আমি মিতুর বান্ধবী।'

'ও মলি, তা কেমন আছ মা?'

'ভালো। আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো আর থাকতে পারছি কই মা।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে মিতুর বাবা বলেন, 'ঝামেলা লেগেই আছে সব সময়।'

'মিতুর বিয়ে নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়েছে নাকি?'

'ঝামেলা আসলে বিয়ে নিয়ে নয়, মিতুকে নিয়ে, ওকে এ বিয়েতে রাজি করাতেই পারছি না।'

'কেন?'

'মলি, তুমি জানো কি না জানি না, ও একটা লাফাঙ্গা ধরনের ছেলের সঙ্গে মেশে। ছেলেটাকে একবার হাতের কাছে পেলে হয়, ধাক্কা দিয়ে ট্রাকের নিচে ফেলে দেব।'

'কেন কেন?'

'সে অনেক কথা মা, তুমি একদিন বাসায় এসো, সব বলব তোমাকে।'

'তার আগে একটু মিতুকে দিন না আংকেল!'

'মিতু কী জন্য যেন রাগ করে আছে, কারো সঙ্গেই নাকি কথা বলবে না। তা ছাড়া ও তো এখন বাসায় নেই, বাইরে গেল একটু আগে।'

'অ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভান করে সেলিম, 'আংকেল, আপনি যে ছেলেটাকে ট্রাকের নিচে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবেন, যদি সে মারা যায়?' আহ্লাদমাখা মেয়েলি কণ্ঠে কথাটা বলে সেলিম।

'আমি তো তা-ই চাইছি মা।'

সেলিম হঠাৎ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, 'কিন্তু এই হত্যার দায়ে পুলিশ তো আপনাকে ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে।' রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেলিম বলে, 'তারপর গাঁটে গাঁটে ডাণ্ডার বাড়ি এবং শেষে ফাঁসি।' মুখটা বিকৃত করে সেলিম বলে, 'তখন বুঝবেন, গলায় দড়ি আটকে গেলে কী মজা!'

'এই, এই ছেলে, তুমি কে?'

'আপনার হবু জামাই।'

রিসিভারটা খট্ করে রেখে দিয়েই সেলিম ফোনের বিল পে করে পাশের মধ্যবয়সী লোকটির দিকে তাকায়। লোকটি ওর দিকে চোখ বড় করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সেলিম মুচকি হেসে আবার মেয়েদের মতো গলার স্বর করে বলে, 'আংকেল, আপনি অনেক ভালো এবং সুইট, আসি আংকেল।'

ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকে বের হয়েই একা একা ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকে সেলিম। মাথা নিচু করে ভাবছে। তার এখন একটাই চিন্তা, যে কোনো উপায়ে হোক

টাকা জোগাড় করতে হবে তার। যে কোনো কাজ সে এখন করবে, তা সে যত ছোট কাজই হোক। তার এখন টাকা দরকার, বিয়ের জন্য টাকা দরকার।

মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে একটা গাছের নিচে দাঁড়ায় সেলিম। বেশ গরম পড়েছে আজ। পাশেই এক ফকির কাঠের গাড়িতে বসে ভিক্ষা করছিল। সেলিমকে দেখে গাড়ি নিজেই ঠেলে নিয়ে এসে তাকে বলে, 'ছার, পাঁচটা টাকা দ্যান, তিন দিন কিছু খাই নাই।'

বিরক্ত হয়ে সেলিম ফকিরের দিকে তাকায়, কিন্তু কোনো কথা বলে না।

ফকিরটি আরো একটু এগিয়ে এসে হাত পেতে বলল, 'ঠিক আছে ছার, তিন টাকা দ্যান।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সেলিম ফকিরের দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে বলে, 'তিন টাকাই যদি থাকত তাহলে সেটা বিয়ের ফান্ডেই জমা করতাম। টাকার চিন্তায় ঘুরে ঘুরে পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'অ, তুই তাইলে বেকার, কাজ খুঁজতাছস?'

'কী ব্যাপার! বেকার শুনেই একেবারে আপনি থেকে তুইতে নেমে এলেন!'

'নামুম তো বটেই। আমার দুই পা নাই, একটা হাত নাই, তাও আমি কাজের মইদ্যে আছি, আর তুই এমন তাজা দামড়া পোলা হইয়াও বেকার। তোরে তুই কমু না তো কী কমু?'

'অত কথা রেখে তুই থেকে ওপরে ওঠেন।'

'এইডা পারুম না, তয় তোর একটা উপকার করতে পারি। একটা কাম দিতে পারি, করবি?'

'কী কাজ?'

'এইহানে ইনকাম ভালো অইতাছে না, আমি গান গামু, তুই গাড়িডা ঠেলবি আর আমার গানের সাথে সুর মিলাবি। ব্যাতন সন্ধ্যার সময় বিশ...।' ফকিরটা একটু থেমে বলল, 'না না, পঁচিশ টাকা পাবি। বাসাবাড়ির খাওন যা মিলব, তা দুইজনে মিল্যা ফিফটি ফিফটি। রাজি?'

সেলিম একটু ইতস্তত করে বলে, 'এ কাজ করা কি ঠিক হবে?'

'ঠিক হইব না মানে?' একটু উত্তেজিত হয়ে ফকিরটি বলে, 'কোনো কাজই ছোট না। আমাদের নবীজি অনেক ছোট ছোট কাজ করছেন।'

'তবুও।'

'কাজ-কাম করতে অইলে অত ভাবতে হয় না।'

সেলিম তবু কী যেন ভাবে, তারপর আমতা আমতা করে বলে, 'কাজটা আজই শুরু করব?'

'আইজ মানে কি, অহন থেইকাই শুরু করবি, কাজে ঢিলামি আমি একদম পছন্দ করি না। তা তোর নাম কী রে?'

'সেলিম।'

'তোরে কাম দিলাম, এখন থাইক্যা তুই আমারে ছার কইয়া ডাকবি।'

'জি স্যার।'

'তা সেলিম্যা, হাত লাগা।'

সেলিম ঠেলার জন্য গাড়ির পেছনে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফকিরটি গান ধরে, 'শোনো মোমিন মুসলমানো, করি আমি নিবেদনো...।'

কাঠের গাড়িতে বসে আছে ফকিরটি, আর শার্ট-প্যান্ট পরা সেলিম গাড়ি ঠেলছে। একটু পরপর আবার ফকিরটির গানের সঙ্গে সঙ্গে সুরও মেলাচ্ছে সে। বেশ কিছুক্ষণ পর সেলিম খেয়াল করে একটি মেয়ে দূর থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সেলিম ভাবে মেয়েটি ভিক্ষা দেবে, সে গাড়ি থামায়। কিন্তু কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেলিম দেখে, মেয়েটি মিতু। দ্রুত কিছু একটা ভেবে নেয় সেলিম, তারপর সে স্বাভাবিকভাবে তাকিয়ে থাকে মিতুর দিকে, যেন মিতুকে চেনা তো দূরের কথা, কোনো দিন দেখেওনি।

মিতু অবাক হয়ে সেলিমকে জিজ্ঞাসা করে, 'এটা কী!'

'আপনি আমাকে বলছেন ম্যাডাম?'

'তুমি শেষ পর্যন্ত এ কাজে নামলে!'

'আপনি কাকে কী বলছেন জানি না।' সেলিম বক্তব্য দেওয়ার ভঙ্গিতে গম্ভীরভাবে বলে, 'তবে এটা একটা কাজ।' একটু থেমে সেলিম আবার বলে, 'দেখুন, বেঁচে থাকার জন্য সবাই কাজ করে। আপনার বাবা হয়তো বড় কোনো অফিসে কাজ করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ রিকশা চালায়, কেউ আমার মতো...।' কথাটা শেষ না করেই কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সেলিম।

'কিন্তু...।'

'কোনো কাজকেই ছোট ভাববেন না ম্যাডাম। কাজ করতে করতেই একজন মানুষ বড় হয়, মহান হয়।'

'তাই বলে...!'

'ওই ব্যাটা।' ফকিরটি হঠাৎ চিৎকার করে সেলিমকে বলে, 'ভিক্ষা নেওনের কাম নাই, এত প্যাচাল কিসের? পা দিয়া লাথি মাইর‍্যা হাড্ডিগুড্ডি ভাইঙ্গা ফালামু তোর, দুই হাত দিয়া কিলাইয়া কিলাইয়া দম আটকাইয়া ফালামু। ঠ্যাল, গাড়ি ঠ্যাল, গান ধর?'

'আমার আল্লা নবীজির নাম...।' সেলিম গান শুরু করে, ফকিরটি এবার সুর মেলায়। গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে সেলিম এগিয়ে যায়। মিতু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেলিমের দিকে। কিছুদূর গিয়েই সেলিম আবার ফিরে তাকায় পেছনের দিকে। দেখে, মিতু দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়। মিতুর চোখে চোখ পড়তেই সেলিম মুখটা বিকৃত করে ফিরে তাকায় আবার সামনের দিকে।

কলবেলের শব্দ শুনেই চম্পা দৌড়ে গিয়ে খুলে দেয় দরজাটা। সঙ্গে সঙ্গে মফিজ সাহেবের বড় মেয়ে নিপাকে দেখে কিছুটা চিৎকার করে বলে, 'বড় আপা আপনে, কহন আইছেন?'

মফিজ সাহেব কলবেলের শব্দ শুনে পাশের রুম থেকে এগিয়ে আসছিলেন, কিন্তু তার আগেই বড় মেয়ে নিপার গলার স্বর শুনে মুখটা কুঁচকে ফেললেন এবং এগিয়ে এলেন না আর এদিকে।

'কিরে, বাবা-মা কই?'

সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই নিপার এ কথাটাও শুনে ফেললেন মফিজ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লম্বা লম্বা করে পা ফেলে নিঃশব্দে চলে গেলেন নিজের ঘরে। তারপর গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে পড়লেন খাটের একপাশে। নিপা 'বাবা বাবা' বলে এ ঘরের দিকে আসতেই মাথাটা আরো নিচু করে ফেললেন মফিজ সাহেব। নিপা তার বাবাকে খুঁজে না পেয়ে এগিয়ে যায় জানালার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ চলে যায় খাটের কোনায়। সেখানে মফিজ সাহেবকে বসে থাকতে দেখেই সে বলে, 'বাবা, তুমি এখানে!'

খাটের পাশ থেকে উঠতে উঠতে মফিজ সাহেব জোর করে মুখে হাসি এনে বলেন, 'পলানটুক, পলানটুক খেলিতেছি মা...।'

'কার সঙ্গে খেলছ বাবা ?' নিপা চারপাশে তাকিয়ে বলে।

সঙ্গে সঙ্গে মফিজ সাহেব কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, 'কার সঙ্গে খেলিব রে মা, আমার কি কেউ আছে? তোর মা সংসার লইয়া ব্যস্ত, তাই আমি আরেকটা... থাক, ওইসব বলিয়া কী লাভ। তা মা, এখন তো আসিলি, যাইবি কখন?'

'তিন-চার দিন থাকব বাবা।'

'তি-ন চা-র দি-ন!' চোখ বড় বড় করে কথাটা বলে নিজেই নিজের মুখ চেপে ধরেন মফিজ সাহেব।

'ভয় পেলে নাকি বাবা?'

'না না, ভয় কিসের, ভয় নাই ভয় নাই, একদম ভয় নাই।' হাত দিয়ে নৃত্যভঙ্গি করেন মফিজ সাহেব।

'মা কোথায় বাবা?' বলতে বলতে নিপা অন্য ঘরে যায়।

মফিজ সাহেব গভীরভাবে নিপার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিপা চোখের আড়াল হতেই মফিজ সাহেব কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলেন, 'ই...ই... এত টাকা

খরচ করিয়া বিবাহ দিলাম, আবার আমার বাড়ি এত ঘন ঘন আসা কেন? অযথা খরচ...!' দু'হাত ওপরে তুলে মফিজ সাহেব বলেন, 'ইয়া মাবুদ, তুমি আমাকে ফতুর করিয়া দিও না মওলা, তাহলে আমি মরিয়া যাইব।'

দরজার ওপাশ থেকে কথাটা শুনতে পায় নিপা। সঙ্গে সঙ্গে বাবার ঘরে ফিরে এসে বলে, 'বাবা, তুমি কী বললে!'

আকাশ থেকে পড়ার মতো চমকে উঠে মফিজ সাহেব বলেন, 'কী বলিলাম!'

'কিছু বলো নাই?'

'নাহ্।'

'সত্যি কিছু বলো নাই?'

নিজের একটা হাত নিজের মুখের ভেতর ঢোকানোর ভঙ্গি করে বলে, 'কই বললাম! আমি তো কিছু বলি নাই, কিছুই বলি নাই!'

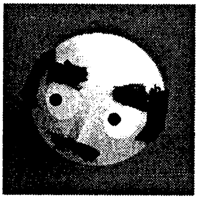

সেলিমের ঘর পরিষ্কার করছে চম্পা। এটা-ওটা পরিষ্কার করতে করতে সে সেলিমের টাকা জমানো ব্যাংকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ব্যাংকটা হাতে নিয়েই সেটার ফুটোর ভেতর একটা কাঠি ঢুকিয়ে খোঁচাতে থাকে সে। কিছুক্ষণ পর অনেক চেষ্টা করে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে সঙ্গে সঙ্গে গুঁজে নেয় কোমরে। তারপর ব্যাংকটা খুব যত্ন করে পরিষ্কার করার ভঙ্গি করে বলে, 'কী সোন্দর ব্যাংক, লাল টকটইক্যা ব্যাংক।'

মামা আর সেলিম হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকছে। চম্পাকে দেখেই সেলিম বলে, 'এই, তুই কী করছিস এখানে?'

'টাকা-পয়সা বড় কঠিন জিনিস ভাইজান, তাই ব্যাংকটারে যত্ন কইর‍্যা পরিষ্কার করতাছি।'

'তুই এখন যা এখান থেকে।'

ব্যাংকটা আগের জায়গায় রেখে চম্পা হাতের কাঠিটা লুকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় দ্রুত। মামা খাটের ওপর পা তুলে বসেছেন, মামার পাশে গিয়ে বসে সেলিম বলে, 'মামা, ও তো ভীষণ খেপে আছে, কিছু একটা বলো।'

'দাঁড়া ভাবছি।'

মামা কী যেন ভাবতে থাকেন মুখে হাত দিয়ে। সেলিম মাথা নিচু করে বসে আছে তার পাশে। কিছুক্ষণ পর মামা মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলেন, 'অভিনয় করতে পারবি?'

'অভিনয়!' সেলিম মামার চোখের দিকে সরাসরি তাকায়।

'হ্যাঁ।' মামা সেলিমের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনেকক্ষণ ফিসফিস করে কী যেন বোঝায়, সেলিম মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর সেলিম কিছুটা হতাশার স্বরে বলে, 'কীভাবে সম্ভব তা।'

'আগে একা একা প্র্যাকটিস কর; তারপর সুবিধামতো...।' মামা মুচকি হেসে বলেন, 'দে, আজকের কামাইগুলো দে, রেখে দিই ব্যাংকে।'

মামার হাতে টাকাগুলো দিয়েই সেলিম বলে, 'মামা, কেমন যেন ভয় করছে।'

'ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।' মামা আগের মতোই হেসে বলেন, 'তোর কথা চিন্তা করতে করতে বড্ড পিপাসা পেয়েছে রে, যা তো, এক গ্লাস পানি নিয়ে আয়, ঠাণ্ডা পানি।'

সেলিম পানি আনতে ডাইনিং রুমের দিকে পা বাড়াতেই মামা একটা নোট নিজের পকেটে ঢোকান। তারপর বাকিগুলো ব্যাংকে ঢুকিয়ে নিজের পরনের জামা দিয়েই ব্যাংকটা মোছার চেষ্টা করেন। সেলিম পানি নিয়ে আসতেই পানিটুকু খেয়ে মামা বলেন, 'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, তুই একা একা প্র্যাকটিস শুরু কর।'

মামা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলিম তার ঘরের দরজাটা চাপিয়ে দেয় আস্তে আস্তে। মেঝের মাঝখানে এসে একবার শ্বাস নেয় বুকভরে। তার দু'পা একটু ফাঁক করে হাত দুটো উঁচু করে এমনভাবে সামনের দিকে তাকায়, যেন মিতু দাঁড়িয়ে আছে সামনে। একটু পর সে এগিয়ে এসে সামান্য কেশে বলে, 'কেমন আছ গোলাপ ফুল, আমার মোরগজবা ফুল, আমার কৃষ্ণচূড়া ফুল, আমার জান...।' সেলিম কথাগুলো বলতে বলতে কারো সামনে হাঁটু মুড়ে বসার মতো মেঝের ওপর বসে বলে, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না গোলাপ ফুল, তুমি আমার জান, প্রাণ...।'

সেলিমের ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যগুলো দেখে ফেলেন মফিজ সাহেব। মুখটা অপূর্ব হাসিতে ভরে ওঠে তার। কিছুটা দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের ঘরে এসে দরজাটা চাপিয়ে দেন মফিজ সাহেব। তারপর সেলিমের মতো বলতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু কিছু বলতে নিয়ে থেমে যান মফিজ সাহেব। ভুলে গেছেন তিনি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেলিম কী বলছিল তা মনে করার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতে শুরু করেন, 'আমার গোলাপ ফুল, আমার... আমার...।'

আবার ভুলে যান মফিজ সাহেব। আবার মনে পড়ে যায় তার, 'আমার ধুতরা ফুল... আমার...।'

ছালেহা বেগম হঠাৎ ঘরে ঢুকে মফিজ সাহেবের কথাগুলো শুনে বলেন, 'আপনি এসব কী বলছেন?'

চমকে ওঠেন মফিজ সাহেব। দ্রুত সরাসরি ছালেহা বেগমের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কিছু বলিতেছি না, নাটক করিতেছি।'

'কিসের নাটক?'

'ছোটবেলায় করিতাম তো, তাই মনে পড়িল। আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও তো, তোমাকে লইয়া একটা নাটক করি?' মফিজ সাহেব জোর করে ছালেহা বেগমকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে হাঁটু মুড়ে বলেন, 'আমার গোলাপ ফুল, আমার কচুরি ফুল, আমার ধুতরা ফুল, আমার মর্জিনা...।'

'এই, মর্জিনাটা আবার কে?'

'মর্জিনার কথা বলিয়াছি নাকি আমি?' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মফিজ সাহেব বলেন, 'না না, মিথ্যা কথা, আমি মর্জিনার কথা বলি নাই, বলি নাই।'

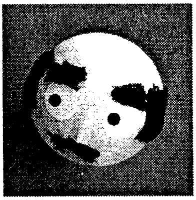

চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে শুয়ে আছে মিতু। মিতুর বাবা জালাল সাহেব দরজায় নক করে সামান্য কেশে ঘরে ঢুকেই বললেন, 'এই অসময়ে শুয়ে আছিস যে মা?'

মাথা থেকে চাদর সরিয়ে মিতু বলল, 'ভালো লাগছে না বাবা।'

'শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'মন খারাপ?'

'না।'

'ক'দিন ধরে দেখছি মুখ গোমড়া করে আছিস।'

'আমার কোনো কিছু ভালো লাগে না।'

জালাল সাহেব মিতুর পাশে খাটের ওপর বসে ওর কপালে হাত রেখে বললেন, 'মা, বল তো ওই ছেলেটার মাঝে তুই কী খুঁজে পেয়েছিস?'

শোয়া থেকে উঠে বসে মিতু। মাথার এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে খোঁপা বেঁধে বলে, 'তুমি বলো তো, তোমার মধ্যে মা কী খুঁজে পেয়েছিল?'

'আহা রে, সে সময় আর এ সময় কী এক হলো?'

'কেন? ভালোবাসার ক্ষেত্রে সব সময়ই এক, এটা তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো বাবা।'

'কিন্তু...।'

'পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে তোমরা মাত্র পাঁচশ টাকা দিয়ে সংসার শুরু করেছিলে, গর্ব করে এ কথাটা তুমি প্রায়ই বলো। আর আমাদের বেলায় যত বাধা, যত অসুবিধা।'

'সময় অনেক বদলে গেছে মা।'

'সময় বদলায়নি বাবা, মানুষ বদলে গেছে। তোমরা যখন আমাদের বয়সী ছিলে, তখন তোমাদের ছিল এক রূপ, আর এখন হয়েছে আরেক রূপ। আমি এসব ঘৃণা করি বাবা।'

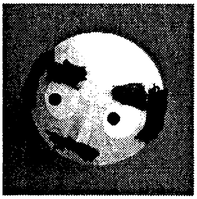

খুব আরাম করে মুখের দিকে একটা পান এগিয়ে দিতেই হাতটা মুখের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনলেন মফিজ সাহেব। জিভে কামড় দিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে তিনি এমনভাবে পানটার দিকে তাকালেন, যেন মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলছিলেন তিনি, প্রচণ্ড রকম ক্ষতি করছিলেন নিজের। হতাশায় মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তিনি পানটার দিকে আরো গভীরভাবে তাকালেন এবং বিড়বিড় করে নিজেই নিজেকে কী যেন বললেন। তারপর ভাঁজ খুলে পানটা ছিঁড়ে পুরো চার ভাগ করে ফেললেন তিনি। পানে চুন-সুপারি-খয়ের কোনো কিছুই খান না মফিজ সাহেব। তিনি মনে করেন, তিনি খাবেন পান, এর সঙ্গে এ ঝামেলাগুলো কেন আবার!

চার ভাগের তিন ভাগ রেখে দিয়ে বাকি এক ভাগ কোনো রকম ভাঁজ করে মফিজ সাহেব মুখে পুরে এমনভাবে চিবোতে লাগলেন, যেন দু-তিনটা পান একসঙ্গে মুখে পুরেছেন তিনি। হঠাৎ ধপ ধপ শব্দ হতেই পাশ ফিরে তাকিয়ে তিনি দেখেন, স্ত্রী ছালেহা বেগম আসছেন তার দিকে। চোখে-মুখে তার রাগ, যেন আগুন লাগিয়ে দেবেন কোথাও। মফিজ সাহেবের ঠিক সামনে এসে তিনি বললেন, 'বিকেলে নিপাকে আপনি কী বলেছেন?'

'আমি আবার কী বলিলাম।' চোখ-মুখে আশ্চর্য ভাব ফুটিয়ে তুলে কাঁদো কাঁদো মুখ করে বললেন মফিজ সাহেব।

'মেয়েটা যে ওভাবে চলে গেল?'

'গিয়াছে ভালো করিয়াছে, খুবই ভালো করিয়াছে। থাকিলে প্রতিদিন কত টাকা খরচ হইত তাহা খেয়াল আছে?'

'ছি, আপনি একটা মানুষ?'

'অন্য কোনো প্রাণীকে তুমি কি কখনো কথা বলিতে দেখিয়াছ?'

দরজার দিকে শব্দ হতেই দুজন ফিরে তাকালেন ওদিকে। নিপা তার স্বামীসহ ছেলেটাকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকছে। মফিজ সাহেব খাট থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, 'মা, তুই না বলিয়া চলে গিয়াছিস মা?'

'না, ভাবলাম বাপের বাড়ি যখন এলাম, তখন সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি। তাই চলে গিয়ে আবার তোমার জামাই-নাতিকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।'

'তা কয় দিন থাকিবি মা?'

'পুরো সাত দিন।' বলেই নিপা স্বামী-সন্তানকে নিয়ে বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

ছালেহা বেগম নিপার পেছনে যাওয়ার জন্য এগিয়ে যেতেই তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলেন মফিজ সাহেব। তারপর নিজের কাছে বসিয়ে দুঃখী দুঃখী গলায় বলেন, ‘সেলিমের মা, আমাকে একটু শক্ত করিয়া ধরো, মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়া উঠিল!’

‘মা, মা।’ বারান্দা থেকে প্রমার ডাক শুনে ছালেহা বেগম মফিজ সাহেবের হাত থেকে নিজের হাতটা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে পা বাড়ালেন বারান্দার দিকে। মফিজ সাহেব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠাস করে অজ্ঞান হওয়ার মতো পড়ে গেলেন বিছানার ওপর। তার আগে খাটের কোনায় মাথাটা লেগে ফেটে গেল মাথাটা। কিন্তু মফিজ সাহেব তা টের পেলেন না, তিনি এবার সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

বারান্দায় পা দিয়েই ছালেহা বেগম রাগী গলায় বললেন, ‘শিয়ালের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন?’

‘আজ আবার কানের সোনার দুলজোড়া খুঁজে পাচ্ছি না।’

‘কীভাবে রাখিস যে খুঁজে পাস না?’

‘কীভাবে আবার রাখি, আগে যেভাবে রাখতাম সেভাবেই রাখি!’

‘তাহলে পাস না কেন?’

‘জানি না।’

ছালেহা বেগম চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ‘আস্তে বল, তোর বাবা শুনলে আবার আরেক কেলেঙ্কারি করে বসবে। তোর বাবা যা করল, নিপা ওর স্বামী-ছেলেকে সঙ্গে এনে আবার চলে গেল এক্ষুণই। কোনো কিছু মুখে দিয়ে গেল না ওরা।’ ছালেহা বেগম একটু থেমে বললেন, ‘এত জিনিস হারাচ্ছে কেন তোর?’

‘এটা আমিও ভাবছি।’ প্রমা পাশে কাজ করতে থাকা চম্পাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ‘যে আমার দুল-মালা নিয়েছে, তাকে পেলে হয়, হাড্ডিগুড্ডি ভেঙে ছালায় ভরে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেব।’ প্রমা চম্পার দিকে তাকিয়ে বলে, ‘ওই ছেমড়ি, সাঁতার জানিস?’

‘জে না আপা।’

‘এবার তাহলে বুঝবি ঠেলা।’

বারান্দার চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন মফিজ সাহেব। সাধারণত চেয়ারে তিনি এভাবে বসেন না, আজ বসেছেন। অবশ্য এর পেছনে দুটো কারণের যে কোনো একটা কারণ অবশ্যই আছে। আর সে দুটো কারণ হলো—

ক. বাসায় আজ কোনো মেহমান আসেনি

খ. কোনো একটা ব্যাপারে কিছু টাকা তিনি সাশ্রয় করতে পেরেছেন আজ।

সেলিমের ঘর থেকে বের হয়ে অলস পায়ে এগিয়ে এলেন মফিজ সাহেবের কাছে এলেন শ্যালক। মফিজ সাহেব একবার শ্যালকের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো সামনের দিকে ফিরিয়ে এনে বললেন, 'কিছু বলিবি বোধহয়?'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে মফিজ সাহেবের আরো একটু কাছে গিয়ে তার শ্যালক বললেন, 'দুলাভাই, কাজের ছেলেটা ছুটি নিয়ে ওদের বাড়ি গিয়েছিল, আপনি নাকি ওকে আর আসতে নিষেধ করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন দুলাভাই?'

'কাজ-কাম তো তুই ভালোই করিতে পারিস?'

'আপনি আমাকে চাকর বানাবেন?'

'আরে দূর, তুই হইলি আমার কুটুম্ব, আপন কুটুম্ব। আচ্ছা, নিপারা তো চলিয়া গিয়াছে, না?'

'আপনি মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে ওরা।'

মফিজ সাহেব পায়ের ওপর থেকে পা'টা নামিয়ে মামার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বেশ আদুরে গলায় বললেন, 'বল তো দেখি-নিপা, নিপার স্বামী আর ওর ছেলে সাত দিন আমাদের এখানে থাকিলে খাওয়া-দাওয়া, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ বাবদ কমপক্ষে কত খরচ হইত?'

মনে মনে একটু হিসাব করে তার শ্যালক বললেন, 'তা তো পাঁচশ টাকা হতোই।'

'আর আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়া খাটের কোনায় টোকা খাইয়া মাথা ফাটাইলাম, তাহাতে ঔষধ আর ডাক্তার বাবদ মোট খরচ হইল তিনশ ত্রিশ টাকা। এইবার খুব ভালো করিয়া একটা হিসাব কর তো—পাঁচশ টাকা হইতে তিনশ ত্রিশ টাকা বাদ দিলে কত থাকে?'

আবার একটু হিসাব করে শ্যালক বললেন, 'একশ সত্তর টাকা।'

আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন মফিজ সাহেব, 'একশ সত্তর টাকা লাভ! নে নে, তুই একটা পান খা।'

শ্যালক বিরক্তিতে একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'পান কই দুলাভাই, আপনি যে পানগুলো চিবিয়ে রেখেছিলেন সেগুলোই তো দিচ্ছেন!'

'তা-ই খা।'

'এগুলো খাওয়া যায় নাকি?'

'কেন?' আশ্চর্য হয়ে বললেন মফিজ সাহেব।

'কেন আবার, এগুলোর ভেতর কিছু আছে নাকি?'

'আছে রে আছে। প্রচুর রস আছে এখনো এইগুলির মধ্যে।' মফিজ সাহেব একটু থেমে বলেন, 'শোন, তোকে একটা কথা বলি। মরুভূমির গাছপালা যেমন মরুভূমির মাটি হইতে রস নেয়, পাথরের ভিতরে বাস করা প্রাণীরা যেমন পাথরের ভিতর হইতেই রস বাহির করে, শুকনা কাঠের ভিতরে বাস করা পোকারা যেমন শুকনা কাঠ হইতেই রস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, তোকেও তেমন জীবনের সবকিছু হইতে রস সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখিবি জীবনটা কত সুন্দর, সেই মধুরসে জীবন কত মধুময়। শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, জীবন হইতে রস আস্বাদন করাই বড় কথা। আর জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা কী জানিস, যেখানে রস নাই, সেইখান হইতেই রস বাহির করিয়া আনা। এই দেখ...।' বলেই মফিজ সাহেব পাশ থেকে চিবোনো পানগুলো মুখে দিয়ে বলেন, 'আমি এইগুলি হইতে আবার রস বাহির করিব। সত্যি বলিতে কি জানিস, মাঝে মাঝে নিজের চিবানো পান আবার মুখে দিয়া চিবাতে বড় আরাম লাগে রে!'

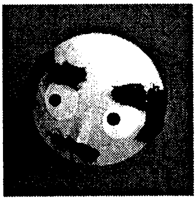

দূর থেকে সেলিমকে দেখে মনে হবে, সেই সুদূর মিসর থেকে কোনো মমি উঠে এসেছে এখানে। পার্থক্য হলো, মমিরা হাঁটতে পারে না, ও হাঁটতে পারছে। আরেকটা পার্থক্য হলো, মমির সারা গায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে, ওর আছে কেবল হাত, পা আর শরীরে। মুখটা সম্পূর্ণ খোলা, পোড়া বেগুনের মতো কুঁচকে রেখেছে সে তার চেহারাটা।

সারা শরীরে ব্যান্ডেজ বাঁধা সেলিমকে রাতের অন্ধকারে দেখে ভূত বলে মনে হলেও, এই দিনের বেলা কিন্তু সে অন্য কিছু। ওর গলায় ওর নিজের দুটো ছবি ঝোলানো আছে একটা ফিতার মতো দড়ি দিয়ে। ছবিটার একটা ব্যান্ডেজ ছাড়া, সম্পূর্ণ হাসি-খুশি এক চেহারা, তার নিচে লেখা আছে 'আগে'। পরের ছবিটা ব্যান্ডেজ করা, ব্যথায় কুঁচকানো চেহারা, তার নিচে লেখা আছে 'পরে'।

হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে সেলিমের, সে তার সামনে সামনে হেঁটে যাওয়া নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরা মামার একটা হাত ধরে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা বড়সড় যাত্রীবোঝাই বাসের কাছে এসে দাঁড়ায় ওরা। বাসের সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগেই সেলিম ফিসফিস করে বলে, 'মামা, কাজটা করতে কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগছে।'

মামা রাগী রাগী চেহারা করে সেলিমের দিকে তাকিয়ে কিছুটা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'লজ্জা করলে আর বিয়ে করার দরকার নেই। ক'দিন আগে এক ন্যাংড়া ফকিরের অ্যাসিসটেন্টও হয়েছিলি, তেমন কিছু কামাই করতে পারিসনি। তাই আজ আমরা নিজেরাই...।' মামা চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে বাসের সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, 'ওঠ ওঠ, তাড়াতাড়ি বাসে ওঠ।'

বাসে উঠতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এমনভাবেই মামার একটা হাত ধরে বাসে উঠল সেলিম। বাসের মাঝখানে এসে মামার কাঁধে হাত রেখে সে মুখ দিয়ে বেশ জোরে জোরে 'আহ্, আহ্' শব্দ করতে থাকে। মামা চারপাশটা একবার পর্যবেক্ষণ করে বলতে শুরু করেন, 'উপস্থিত ভাই-বোন-বন্ধুগণ, আপনারা যে যেখানেই যান, আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। যাত্রাপথে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করুন, পকেট সাবধান রাখুন।'

সেলিম আহ্ উহ্ করতে করতেই মামার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'মামা, ইউ আর গ্রেট!'

মামা সেলিমকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করতেই সেলিম সরে দাঁড়ায়। মামা এবার তার চেহারাটায় কান্না কান্না ভাব করে বলেন, 'আমার পাশে যে ছেলেটাকে দেখছেন, এইটা আমার ছোট ভাই।'

সেলিম কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আহ্ উহ্ বন্ধ করে জিভে কামড় দেয়। মামা সেলিমের কাঁধে হাত দিয়ে আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে বলেন, 'বড় মেধাবী ছাত্র ছিল ও, ভার্সিটিতে পড়ছিল, টিউশনি করে আমাদের সংসার চালাইত। একবার...।' মামা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করেন, 'একবার এক ট্রাকের নিচে পড়ে জীবনটা ওর ভাজা ভাজা হয়ে গেল।' মামা কাঁদতে কাঁদতে ফোঁপাতে থাকেন, 'এখন পথে নামা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না জনাব।'

পেটের ভেতর থেকে হাসি এসে গলা দিয়ে বের হওয়ার আগেই সেলিম সেটা আবার পেটে পাঠিয়ে দেয়। হাসির কাঁপুনিতে থরথর করে পেটটা কাঁপছে তার। যাত্রীরা টের না পেলে হয়! সেলিম আরো জোরে আহ্ উহ্ করতে লাগল। মামা ওকে নিয়ে একে একে সব যাত্রীর সামনে যাচ্ছেন আর হাত পেতে বলছেন, 'আপনাদের দোয়া আর সাহায্য পেলে ওর সুচিকিৎসা করাইতে পারি।'

হঠাৎ এক যাত্রী সেলিমের গলায় 'আগে' লেখা ছবিটার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে তার পাশে বসা একজনকে বলে, 'দেখেছিস, কী সুন্দর চেহারা আছিল পোলাডার, এক্কেবারে জাহিদ হাসানের মতো ফেস কাটিং।'

পাশের জন সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'আহা রে! আমরা স্নো-পাউডার মাইখাও চেহারাডা এমন সুন্দর করতে পারি না, আর হে এত সুন্দর চেহারা পাইয়াও ট্রাকের নিচে পইড়া শ্যাষ। দে, দুইডা ট্যাকা বেশি দে।'

সবগুলো যাত্রীর কাছে ঘুরে সেলিমকে নিয়ে মামা বাস থেকে নেমে পড়লেন। কিছুদূর গিয়ে একটা আড়ালমতো জায়গায় দাঁড়িয়ে সেলিম বলল, 'মামা, কী সুন্দরভাবে তুমি সবকিছু ম্যানেজ করলে, আড়ালে-আবডালে ভিক্ষা-টিক্ষা করো নাকি তুমি?'

মামা অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেলিমের দিকে তাকাতেই দেখেন, বৃদ্ধমতো তিনটা ফকির এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। একজনের হাতে দুটো ক্রাচ, একটা পা নেই তার; একজনের দুটো হাতই নেই, আরেকজন অন্ধ। মামা সেলিমকে নিয়ে অন্যদিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই হাতকাটা ফকিরটি বলল, 'ওই মিয়া, খাড়াও।'

মামা সেলিমকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। ফকির তিনটা সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের সারা চোখে রাগ, রাগী চোখে তারা তাকিয়ে আছে সেলিমদের দিকে। হঠাৎ পা-কাটা ফকিরটি বলল, 'নাম কী?'

মামা সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'স্লামালাইকুম, ভালো আছেন আংকেল?'

অন্ধ ফকিরটি একটু এগিয়ে এসে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'ও নাম জিগাইছে, নাম বলেন।'

সেলিম ভয়ে ব্যথা ব্যথা কণ্ঠে বলে, 'মামা, নাম কও।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মামা অন্ধ ফকিরটির একটা হাত ধরার চেষ্টা করেন। অন্ধ ফকিরটি ঝাঁকি দিয়ে মামার হাত থেকে নিজের হাতটি ছাড়িয়ে নেয়। মামা তবুও

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, 'নাম দিয়ে কী হবে ভাইজান, ক'দিনের দুনিয়া, ক'দিনইবা বাঁচব।'

'লাইসেন্স নম্বর কত?' হাতকাটা ফকিরটি মামার দিকে তাকাল।

'কিসের লাইসেন্স, ভাইজান?'

'কিসের লাইসেন্স মানে? এই এলাকায় ভিক্ষা করতে অইলে লাইসেন্স লাগে।' পা-কাটা ফকিরটা ক্রাচসহ আরো দু'পা এগিয়ে আসে মামার দিকে।

'লাইসেন্স পাব কই, আমাদের তো কোনো লাইসেন্স নেই ভাইজান।' মামা মুখটা কান্না কান্না করে বলেন।

'লাইসেন্স ছাড়া ফকির?' অন্ধ ফকিরটি তখন পাশের দুজনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'ওই, কয় কি অরা?'

কথা বলতে বলতে আরো কয়েকজন ফকির এসে জড়ো হয়েছে ওদের সঙ্গে। হাতকাটা ফকিরটি সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমাগো পাতে না কয়াই হাত বাড়াইছে ওরা।'

পা-কাটা ফকিরটি হাতকাটা ফকির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলে, 'ধর শালাগো, ঘেটি ভাইঙ্গা ফালা...।'

সঙ্গে সঙ্গে মামা আর সেলিম দৌড়াতে থাকে। পেছনে পেছনে ফকিরগুলোও দৌড়াতে থাকে।

রিকশায় করে ভার্সিটি থেকে ফিরছিল মিতু। হঠাৎ অনেকগুলো মানুষের 'ধর ধর' শব্দ শুনে সেদিকে তাকিয়ে দেখে, সারা শরীরে ব্যান্ডেজ বাঁধা সেলিম আর ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে মামা দৌড়াচ্ছেন। তাদের পেছনে অনেকগুলো ফকির, প্রায় সবার হাতে লাঠি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, দু'হাত কাটা একটা ফকির সবার আগে আগে দৌড়াচ্ছে আর বলছে, 'ধর শালাগো, মার শালাগো।'

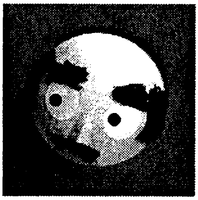

বাসা থেকে বের হয়ে মফিজ সাহেব কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। গেটের বাইরে পা রাখতেই দেখেন একটা লাল টকটকে গাড়ি এসে থামল তার বাসার সামনে। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। গাড়ি থেকে একটা মেয়ে নেমে গট-গট করে এগিয়ে আসছে তার দিকে, মেয়েটির হাতে দুটো প্যাকেট।

মেয়েটি কাছে আসতেই মফিজ সাহেব বেশ বিনয়ী হয়ে বললেন, 'আম্মাজান, তুমি কে?'

মিতু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি কে?'

মফিজ সাহেব বোধহয় একটু ভয় পেলেন। তিনি নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমার নাম মফিজ।'

'ও, আংকেল, স্লামালিকুম। একদম চিনতে পারিনি আপনাকে। আমি ভেবেছিলাম বাড়ির কোনো কাজের লোক আপনি।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি!' মফিজ সাহেব নিজের শরীরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে মিতুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এবার তুমি বলো, তুমি কে?'

'আমি প্রমার বান্ধবী।' মিতু খুব সহজে মিথ্যে পরিচয়টা দিয়ে ফেলল।

'ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, না অল্পঘনিষ্ঠ?'

'বান্ধবী বান্ধবীই। ঘনিষ্ঠ-অল্পঘনিষ্ঠ কী আবার?'

'হ্যাঁ ঠিক কথা, একেবারে খাঁটি কথা। তা আম্মাজান, তোমার হাতে ও দুটা কিসের প্যাকেট?'

'মিষ্টির।'

'কয় কেজি?'

'দুই কেজি।'

'মাপে কম দেয় নাই তো?'

'না আংকেল।'

'তা কতক্ষণ থাকিবা আম্মা।'

'একটু পরেই চলে যাব।'

'হ্যাঁ, তাই যাইও। না হইলে তোমার বাবা-মা আবার ভীষণ চিন্তা করিবেন।'

মফিজ সাহেব একটু পাশে সরে দাঁড়ান। মিতু এগিয়ে যায় বাসার দিকে। মফিজ সাহেবও সামনের দিকে দু'পা এগিয়েই পেছন ফিরে তাকান। মিতুকে বাসার ভেতর ঢুকতে দেখেই তিনি ঘুরে দাঁড়ান বাসার দিকে।

পা টিপে টিপে বাসার ভেতর ঢুকে মফিজ সাহেব সোজা চলে যান ডাইনিং রুমের কাছে। দরজার আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখেন ভেতরটা। মিষ্টির প্যাকেট দুটো রাখা হয়েছে ডাইনিং টেবিলে। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে ডাইনিং টেবিল থেকে প্যাকেট দুটো নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন মফিজ সাহেব।

খুব মনোযোগ দিয়ে টেবিলে বসে গুরুত্বপূর্ণ একটা হিসাব করছিল সেলিম। সে টের পেল, কে যেন হনহন করে তার ঘরে এসে ঢুকল। সে আগের মতোই হিসাব করতে লাগল, গুরুত্বপূর্ণ হিসাব, আপাতত কোনো দিকে খেয়াল করা যাবে না।

হিসাবটা যখন মিলে আসছিল, ঠিক ওই মুহূর্তেই ঘাড়ে একটা গরম নিঃশ্বাস পড়ল সেলিমের। ঝট করে সে ঘুরে দাঁড়াল, তার লালচে চোখ দুটো ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুহূর্তেই। মিতু তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সে আগুনচোখে।

বুকের ভেতর ধুকধুক শব্দটা বেড়ে যেতেই সেখানে কৌশলে হাত দিয়ে চাপা দিল সেলিম। একটু পর মিতুর একটা হাত ধরার চেষ্টা করতেই হাতটা সরিয়ে নিল সে। সঙ্গে সঙ্গে এই বিব্রতকর মুহূর্তটা কাটিয়ে ওঠার জন্য মুখে যতটুকু হাসি আনা সম্ভব ঠিক ততটুকু এনে সেলিম মিতুকে বলল, 'তুমি কি জানো, রাগলে তোমাকে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী মনে হয়!'

মিতু চিবিয়ে চিবিয়ে অথচ খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'আর না রাগলে?'

'মঙ্গল গ্রহ আর পৃথিবীতে যত সুন্দরী আছে, তাদের সেরা সুন্দরী মনে হয়।'

'মঙ্গল গ্রহের সুন্দরীদের তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, না না, ওদের দেখতে যাব কেন আমি, আমার তুমি আছ না?'

'কথা দিয়ে মানুষকে পটাতে পার খুব সহজে।'

সেলিম সঙ্গে সঙ্গে মিতুর একটা হাত জাপটে ধরে বলল, 'তুমি পটেছ?'

'পটেছি বলেই তো বারবার ফিরে আসি, না হলে...।'

'না হলে?'

'না হলে এতক্ষণে তোমায় গলা টিপে মারতাম।'

'এখন মারছ না, বিয়ের পরে মারবে না তো?'

'মারতেও পারি।'

'তাহলে একটা ইনস্যুরেন্স করে রাখি। যখন তোমার টাকার দরকার হবে, তখন আস্তে করে আমার গলা টিপে মেরে ফেলো, সব টাকা পেয়ে যাবে।'

'এসব প্যাঁচাল রাখো এখন।' মিতু সেলিমের খাটের ওপর পা তুলে বসে বলল, 'তুমি এসব কী শুরু করেছ?'

মিতুর পাশে বসতে বসতে সেলিম বলল, 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না গোলাপ ফুল!'

'সেদিন দেখলাম তুমি ভিক্ষা করছ এক ন্যাংড়া ফকিরের সঙ্গে, কালকে দেখলাম বেশ কয়েকজন ফকির তোমাকে আর মামাকে তাড়া করছে। কারণ কী?'

'তুমি এসব কী বলছ মিতু!'

'ঠিকই বলছি। তুমি আর মামা কি ফকিরদের টাকা চুরি করেছিলে নাকি?'

'তুমি যে কী বলো না!'

'আমি কি ভুল বললাম?'

'হ্যাঁ, তুমি ভুল বলছ, আমার মতো দেখতে আর কোনো ছেলে থাকতে পারে না এ পৃথিবীতে?'

'না, পারে না।'

'আমি তো হুবহু তোমার মতো চেহারার একটা মেয়েকে দেখেছি।'

মিতু একটু উৎসুক হয়ে এগিয়ে এসে বলে, 'কোথায়?'

'বলা যাবে না।'

'বলা যাবে না কেন? ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। তুমি যদি দু-তিন দিনের মধ্যে একটা কিছুর ব্যবস্থা করতে না পার, তাহলে আমি বিষ খাব।'

মিতু যেভাবে ঘরে ঢুকেছিল, ঠিক সেভাবেই হনহন করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিষ্টির প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে সোজা মিষ্টির দোকানে চলে এলেন মফিজ সাহেব। মিতু এ দোকান থেকেই মিষ্টি কিনেছে। মিষ্টির প্যাকেটের ওপর নাম ও ঠিকানা দেখে মফিজ সাহেব দোকানে ঢুকেই প্যাকেট দুটো দেখিয়ে একজনকে বললেন, 'ভাইজান, এইগুলি তো আপনাদের দোকানের মিষ্টি, না?'

বিক্রেতার মতো দেখতে একজন মফিজ সাহেবের কাছে এসে বলল, 'হ্যাঁ।'

'এইখানে কত কেজি মিষ্টি আছে?'

বিক্রেতা প্যাকেট দুটো নিয়ে মেপে বলল, 'দুই কেজি।'

'এই দুই কেজি মিষ্টির দাম কত?'

প্যাকেট দুটো খুলে মিষ্টিগুলো দেখে বিক্রেতা বলল, 'একশ ত্রিশ আর একশ ষাট, মোট দুইশ নব্বই টাকা।'

দু'কান পর্যন্ত হাসি দিয়ে মফিজ সাহেব বিক্রেতাকে বললেন, 'ধন্যবাদ।'

মিষ্টির দোকান থেকে বের হয়ে এলেন মফিজ সাহেব। রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন আর মনে মনে কী যেন হিসাব করছেন। কিছুদূর যাওয়ার পর একজন শিক্ষিতমতো লোককে দেখে মফিজ সাহেব সালাম দিয়ে বললেন, 'একটা কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম আপনাকে।'

লোকটি হাঁটা থামিয়ে বললেন, 'বলুন।'

'ধরুন একটা মেয়ে আমার বাসায় আসিল, তারপর সে প্রথমে ফ্যানের নিচে বসিবে, তাহাতে বিদ্যুৎ খরচ হইবে ধরুন ৩ টাকা, ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি খাইবে চার

গেলাস, এ চার গেলাস ফোটানো পানির দাম ৪ টাকা, দুপুরে খাইবে, এই ধরুন...।' মফিজ সাহেব একটু ভেবে বলেন, 'এই ধরুন ২৫ টাকা, বিকালের নাশতা ১২ টাকা, পানির জন্য খরচ হইবে আরো ২ টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ে ১৫ টাকা। তাহা হইলে মোট খরচ হইল কত?'

লোকটি একটু হিসাব করে বললেন, 'একষট্টি টাকা।'

'যদি এখন দুইশ নব্বই টাকা হইতে একষট্টি টাকা বাদ দেই, তাহা হইলে কত দাঁড়ায় ভাইজান?'

'দুইশত উনত্রিশ টাকা।'

'সত্যি?' মফিজ সাহেব কিছুটা লাফিয়ে ওঠেন।

'হিসাবে তো তা-ই বলে।'

মফিজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে লোকটার একটা হাত ধরে হ্যান্ডশেক করার ভঙ্গিতে বলেন, 'ভাইজান, বহুত লাভ!'

লোকটি অবাক হয়ে মফিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে কিছুটা আস্তে আস্তে বলেন, 'ভাইসাহেব, মতলব কী? নতুন আরেকটা বিয়া করবেন নাকি, এত হিসাব করতাছেন যে!'

ডাইনিং টেবিলের ওপর মিষ্টির প্যাকেট দুটো রেখে চুপচাপ নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন মফিজ সাহেব। বিছানায় শুতে নিয়েই আমার উঠে বসলেন তিনি। ছালেহা বেগম হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, 'আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

'কেন?'

'মিষ্টির দুটো প্যাকেট ছিল ডাইনিং টেবিলের ওপর, একটু পর দেখি নাই। এখন আবার গিয়ে দেখি প্যাকেট দুটো আগের মতোই আছে।'

'সব জিন-ভূতের কারবার।'

'মিতু মেয়েটা চলে যাচ্ছিল, জোর করে ধরে রেখে খাওয়াতে বসিয়েছি, আপনিও চলেন।'

ঝট করে খাট থেকে নামলেন মফিজ সাহেব। ছালেহা বেগমের আগে আগে হেঁটে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'চলো।'

মিতুসহ সবাই খেতে বসেছে ডাইনিং টেবিলে। মফিজ সাহেব তার নির্ধারিত চেয়ারে না বসে মিতুর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেন। সবার দিকে একবার তাকিয়ে মিতুর আরো একটু কাছে গিয়ে বললেন, 'আজ আমি সবাইকে তুলে খাওয়াব।' মফিজ সাহেব মিতুর প্লেটে একটা মাংসের টুকরো দিয়ে বললেন, 'আম্মাজান, আজকাল ছেলেমেয়েরা তো মাছ-মাংস তেমন পছন্দ করে না, বোকা ওরা। তা আম্মাজান, তুমি কিন্তু এই পুরো মাংসের টুকরোটাই খাইবে, তারপর উঠিবে, হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে আংকেল।'

ভাতের ডিশ থেকে চামচ দিয়ে ভাত তুলে মফিজ সাহেব মিতুর দিকে এগিয়ে দিতেই আবার চামচটা একটু পেছনে এনে বললেন, 'আরো দুই চামচ ভাত দিব মা? তুমি কি জানো, বেশি ভাত খাইলে মানুষ বেশি মোটা হইয়া যায়? মোটা মানুষকে দেখিতে ভালো লাগে না। তুমি এক চামচই নাও।'

ফিক করে হেসে ফেলে মিতু। কিন্তু তার আগেই ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে সে এবং সেভাবেই হাসতে থাকে ফিকফিক করে।

'খাওয়ার সময় হাসতে হয় না আম্মাজান, গলায় ঠেকিয়া যায়। তা মা, সালাদ পছন্দ করো তুমি?'

'মোটামুটি।'

'ঠিক আছে, এক টুকরো শসা নাও, কচকচ করিয়া ভাতের সঙ্গে খাও, দেখিবে, কী মজা।'

'আপনিও বসেন না আংকেল?'

কৌশলে সব খাবার আস্তে আস্তে নিজের দিকে টেনে নিয়ে মফিজ সাহেব তৃপ্তির একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো বলিয়াছ, এইবার আমি বসি।'

ভাত খেতে খেতে আড়চোখে মিতুর দিকে তাকাচ্ছেন মফিজ সাহেব। একটু পর মিতু খাওয়া থেকে উঠে বেসিনের দিকে এগিয়ে যেতেই মফিজ সাহেবও দ্রুত প্লেটের শেষ খাবারটুকু মুখে দিয়ে বেসিনের দিকে পা বাড়ালেন। মিতুকে সাবানের দিকে হাত বাড়াতে দেখেই তিনি বললেন, 'করো কী আম্মাজান, করো কী!'

'সাবান নিচ্ছি আংকেল, হাত ধোব।'

'তুমি কি জানো না আম্মাজান, সাবানে অনেক ক্ষার থাকে?'

'জি আংকেল, জানি।'

'ক্ষারে হাতের চামড়া নষ্ট হয়, এটা জানো?'

'জি, এটাও জানি।'

'তাহলে সাবান হাতে মাখিতেছ কেন মা?' মফিজ সাহেব নিজের তেল লাগানো হাতটা নিজের মাথার সঙ্গে ঘষতে ঘষতে বলেন, 'দেখো, আমি তাই আমার হাতের তৈলগুলি আমার চুলে মাখিয়া নিচ্ছি। ইহাতে হাতও পরিষ্কার হইতেছে, মাথার চুলেও তৈল দেওয়া হইতেছে। যদিও মাথায় তৈল না দিলে কিছু হয় না। তুমি কি কখনো কোনো ছাগলকে গায়ে তৈল দিতে দেখিয়াছ?'

'না।'

'তবুও দেখো উহাদের গায়ের চুল কত কালো। আম্মাজান, তুমিও তৈলগুলি ধুইয়া না ফেলিয়া মাথায় মাখো, তাহাতে সাবানের ক্ষারে তোমার হাতও নষ্ট হইবে না, মাথাতেও অনেক আরাম বোধ করিবা।' মফিজ সাহেব কথাটা বলেই মিতুর ডান হাতটা ধরে মিতুর মাথার সঙ্গে ঠেকিয়ে দেন, মিতু সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় হাতটা ঘষতে থাকে। তৃপ্তির একটা হাসি দিয়ে মফিজ সাহেব বলেন, 'কী আম্মাজান, আরাম লাগিতেছে না?'

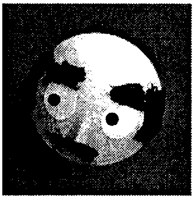

মামা কানে কানে সেলিমকে কথাটা বলতেই সেলিম চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'ব্যাপারটা বেশি হয়ে যাবে না মামা?

'না।'

'আমার মনে হয় একটু বেশিই হয়ে যাবে মামা।'

'বিয়ের মতো বড় একটা কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিস তুই, তাহলে বেশি রকমের কিছু কাজ করতে হবে না তোর?'

'তা ঠিক বলেছ।'

'যা-তা ব্যাপার নয়, বিয়ে। বুদ্ধিমানরা বিয়ে করার আগে অনেক বড় বড় কাজ করে, অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নেয়।'

'ঠিক ঠিক।'

'তোর বাবা-মা তো গতকাল গ্রামের বাড়ি গেছে।'

'প্রমাও সঙ্গে গেছে। গ্রামে আমাদের কিছু জমি আছে, সেগুলো নিয়ে কী একটা ঝামেলা নাকি হয়েছে।'

'ওরা কবে আসবে?'

'আজ বিকেলে নাকি আসবে।'

'বাসায় এখন কেউ নেই, এই সুযোগ। এবার বল, বুবু-দুলাভাইয়ের ঘরে দামি কী কী জিনিস আছে।'

'অনেক কিছুই তো আছে।'

'চল আমার সঙ্গে।'

বড় রাস্তার ফুটপাতের ওপর জিনিসগুলো সাজিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে মামা আর সেলিম। কিছুক্ষণ পর টেবিলঘড়িটা হাতে নিয়েই সেলিম বলল, 'এই ঘড়িটা আমাকে সেদিন প্রায় ধরিয়েই দিয়েছিল। আমি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিং ক্রিং বেজে ওঠে বেয়াদবটা। মামা, ঘড়িটাকে একটা আছাড় দিই?'

'না, মাফ করে দে ওকে।'

'মামা, প্রমার গলার চেইন, কানের দুল তো চুরি করে ধরা পড়ি নাই, আশা রাখি বাবার ঘরের এগুলো চুরি করেও ধরা পড়ব না, তুমি কী বলো?'

'ইনশাল্লাহ।'

জিনিসগুলোর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে মামা তৃপ্তির একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'এবার আমি যা বলি তা শোন।'

'বলো মামা।'

'আমি বলব, যা নিবেন ভাই বিশ টাকা, তারপরই তুই বলবি, এক দাম বিশ টাকা। ঠিক আছে?'

'ওকে মামা।'

'যা নিবেন ভাই বিশ টাকা...।'

'একদাম বিশ টাকা...।'

'বাইচ্ছা লন বিশ টাকা...।'

'একদাম বিশ টাকা...।'

'দেইখ্যা লন বিশ টাকা...।'

'একদাম বিশ টাকা...।'

'দামি জিনিস বিশ টাকা...।'

'একদাম বিশ টাকা...।'

হঠাৎ একটা পুলিশের গাড়ি এসে হুট করে ব্রেক কষে দোকানটার সামনে। কয়েকজন পুলিশ দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে এসে মামা আর সেলিমকে ধরে ফেলে। হকচকিত মামা বিশাল গোঁফধারী এক পুলিশকে ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'ভাই, কোন দোষে আমাদেরকে এভাবে...।'

'চোপ ব্যাটা!' হুঙ্কার দিয়ে ওঠে গোঁফধারী, 'ফুটপাতে দোকান করস, আবার জিগাস কোন দোষে? আগে থানায় চল, তারপর বুঝায়া দিমুনে কোন দোষে।'

মাম-ভাগ্নেকে গাড়িতে তুলে থানার উদ্দেশে ছুটে চলে পুলিশ বাহিনী।

সোফার ওপর এক পা তুলে আরেক পা নিচে রেখে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন জালাল সাহেব। একটু দূরে মিতু বেতের মোড়ার ওপর বসে মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছে অনেকক্ষণ। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সে। গভীরভাবে তাকিয়ে এগিয়ে যায় বাবার দিকে। একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে একটু থামে, তারপর তার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে বলে, 'বাবা, কথাটা তুমি জানো, তবুও তোমাকে বলি। ভালোবাসা হচ্ছে আগুনের মতো, সারাক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বলে বুকের ভেতর, অস্তিত্বের ভেতর। বুকের ভেতরের ভালোবাসা হয়তো কখনো কখনো নিভে যায়, কিন্তু অস্তিত্বের ভালোবাসা?

সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরও ভালোবাসার অনেক মানুষ কখনো একা একা কাঁদে, দীর্ঘশ্বাসে ভারি করে বাতাস, চুপচাপ কাটিয়ে দেয় দীর্ঘ মুহূর্ত, কেন বাবা? সেটা অস্তিত্বের ভালোবাসা বলে।

বাবা, তুমি চাইছ না সেলিমের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক। তোমার স্ট্যাটাস তালিকাতে ও নেই। তবে তা-ই হোক বাবা, আমি ওকে ভুলে যাব।'

মিতু ওড়না দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'আমার বড্ড অবাক লাগে বাবা, একটা ছেলে তার ভালোবাসার মানুষের জন্য কত রকম পাগলামি করে, তার বাবা রাজি হয় না বলে সে নিজেই বিয়ের টাকা যোগানোর জন্য কী অভিনব পদ্ধতি বেছে নেয়, শেষে তাকে এর জন্য পুলিশের কাছেও ধরা পড়তে হয়।

ভালোবাসায় কতটা পাগল হলে এমন হয় বাবা, এত তীব্রভাবেও ভালোবাসতে পারে মানুষ এমন করে!

বাবা, আমি তোমার সব কথাই শুনব, তুমি কি শুধু আমার একটা কাজ করে দেবে? ও এখন জেলে, তুমি কি একটাবার ওর সামনে আমাকে একটু নিয়ে যাবে? আমি শুধু ওর একটা হাত ছুঁয়ে বলব—তোমার সাধারণত্ব ছুঁয়ে আমি অসাধারণ হতে চেয়েছিলাম, তা হলো না বন্ধু।'

মিতু উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে চলে যায় ওর ঘরে। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। হঠাৎ মাথায় একটা ছোঁয়া পেতেই ফিরে তাকায় সে। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন কাছে, ছলছল করছে তার চোখ দুটো। মিতু উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে ওর একটা হাত ধরে বাইরের দিকে পা বাড়ান জালাল সাহেব।

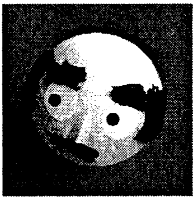

মফিজ সাহেবের মনে হলো, তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। গ্রাম থেকে এসে ঘরে ঢুকেই তিনি কেমন যেন হয়ে গেছেন। ঘরের জিনিসপত্র প্রায় অর্ধেক নেই, সব উধাও হয়ে গেছে। প্রমা ওর ঘর থেকে দৌড়ে এসে বলল, 'মা, আমার ঘরেরও অর্ধেক জিনিস নেই।'

ছালেহা বেগম রেগে গিয়ে বললেন, 'জিনিস গেছে জিনিস পাওয়া যাবে, এখন যা।' প্রমার দিক থেকে ফিরে মফিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে ছালেহা বেগম বললেন, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন? পাশের বাসার মোতালেব সাহেব আপনাকে কী বলল? আপনার ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, আপনি ছাড়ানোর ব্যবস্থা করেন। ছেলেটা আমার কী কষ্টই না পাচ্ছে!' ছালেহা বেগম মফিজ সাহেবের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন! জিনিস তো গেছে ভালো, যদি আমার ছেলেটার কিছু হয়, তাহলে আমি এই সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দেব।'

মফিজ ভীষণ বিরক্তমুখে বললেন, 'খালি ফ্যাতফ্যাত করে, আমি কী না করিয়াছি নাকি, যাইতেছি তো।' একটু এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পকেট একটা দশ টাকার নোট বের করে বিড়বিড় করে বলেন, 'না জানি কত টাকা-পয়সা খরচ হয়, আমি ফকির হইয়া যাইব...।'

'মা, পাশের বাসার আন্টি কী বলেছেন, শুনেছ? দুপুরের পরপরই নাকি চম্পাকে বাসা থেকে বের হতে দেখেছেন। ও বোধহয় পালিয়ে গেছে মা।'

মফিজ সাহেব ঘরের বাইরে পা দিতেই আবার ঘুরে দাঁড়ান, 'অ্যা, বলিস কি! কী কী নিয়া গিয়াছে, বুঝতে পারছিস মা?'

'না বাবা।'

'আমি ফতুর হইয়া গিয়াছি, আমি ফকির হইয়া গিয়াছি।'

বাসার কলবেলটা হঠাৎ বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মফিজ সাহেব প্রমাকে বলেন, 'দেখ তো মা, কে?'

ছালেহা বেগম কিছুটা চিৎকার করে বলেন, 'আপনি দেখতে পারেন না!'

ভয় ভয় পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে দরজা না খুলেই মফিজ সাহেব বলেন, 'কে, কে ওখানে?'

বাইরে থেকে শব্দ আসে, 'আমরা, বাবা।'

কথাটা শুনেই ছালেহা বেগম দ্রুত এগিয়ে আসেন দরজার কাছে। তারপর মফিজ সাহেবকে ছোটখাটো একটা ধাক্কা দিয়ে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে তিনি দরজাটা খুলে ফেলেন। সেলিম ও মামা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, পেছনে মিতু মিটিমিটি হাসছে, জালাল সাহেবের মুখেও গম্ভীর হাসি।

সবাই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মিতুকে দেখে এগিয়ে যান মফিজ সাহেব, 'আম্মাজান, তোমাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি?'

মিতু হাসতে হাসতে বলে, 'আংকেল, আমি আপনার বাসায় এসেছিলাম, আপনি আমাকে খুব যত্ন করে খাইয়েছিলেন।'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়িয়াছে।' জালাল সাহেবের দিকে ইশারা করে মফিজ সাহেব বলেন, 'তা উনি কে?'

মফিজ সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেলিম বলল, 'বাবা উনি মিতুর বাবা, আমাদের ছাড়িয়ে এনেছেন জেল থেকে।'

'আসসালামু আলাইকুম।' মফিজ সাহেব দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন জালাল সাহেবের দিকে।

মফিজ সাহেবের হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জালাল সাহেব বললেন, 'ভাইসাহেব, আপনার সঙ্গে আমি আলাদাভাবে একটু কথা বলতে চাই।'

জালাল সাহেব আর মফিজ সাহেব হাত-ধরাধরি করে ঘরের এক কোনায় গিয়ে দাঁড়ান। তারপর ফিসফিস করে কী যেন আলাপ করেন। হঠাৎ মফিজ সাহেব কিছুটা চিৎকার করে বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। ওগো সেলিমের মা, উনি কী বলিতেছেন, শুনিয়াছ?'

ঘোমটা টেনে নিয়ে ছালেহা বেগম একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'উনি কী বলেছেন আমি জানি।'

মফিজ সাহেব অবাক হয়ে বলেন, 'তুমি জানো! কই, আমাকে তো কিছু বলো নাই, কিছুই তো বলো নাই!'

'আপনাকে বললে কী লাভ হতো?'

'দেখিয়াছেন বিয়াই সাহেব।' মফিজ সাহেব তার স্ত্রীর দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে হতাশার ভঙ্গিতে বলেন, 'আমার সংসার, আমার ছেলে, আর আমাকে বলে কিনা কোনো লাভ নাই!'

'শুধু তোমার সংসার, তোমার ছেলে, আমার কিছু না?' ছালেহা বেগম রাগতে গিয়েই থেমে গেলেন।

'বিয়াই সাহেব, বিয়াইন সাহেবা কিন্তু ঠিকই বলেছেন।' জালাল সাহেব মফিজ সাহেবের দিকে তাকিয়েই ছালেহা বেগমের দিকে তাকালেন।

'আপনি ঠিক বলিতেছেন?' মফিজ সাহেব জালাল সাহেবের দিকে তাকান।

জালাল সাহেব মফিজ সাহেবের একটা হাত চেপে ধরে বলেন, 'ঠিক।'

'আপনি যখন বলছেন, তাহা হইলে আমি মানিয়া লইলাম। এখন আসল কথায় আসা যাক। আপনার একমাত্র মেয়ে, আমারও একমাত্র ছেলে, দুইজন দুইজনকে

ভালোবাসে, পেয়ার করে, ভালো। বিবাহ হইবে উহাদের, অসুবিধা কী, অসুবিধা নাই। এখন হইতে আপনার সবকিছু আমার, আমার সবকিছুও আমার। ধুত্তরি, সবকিছু আমাদের। ওরে গর্দভ'— মফিজ সাহেব শ্যালকের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'যা, এই দশটা টাকা দিলাম, পুরো টাকারই মিষ্টি কিনিয়া আনিবি।'

মামা মুখ বাঁকা করে বলেন, 'দশ টাকার আবার মিষ্টি আছে নাকি, কৃপণতার একটা সীমা থাকা উচিত!'

'দেখলেন বিয়াই সাহেব, কী বলে?'

মফিজ সাহেব পকেটে হাত ঢুকিয়ে তা বের না করেই মুখটা কুঁচকে বলেন, 'আমার কাছে তো একটিই মাত্র দশ টাকার নোট, আর সব পাঁচশ টাকার নোট। কী যে করি, আচ্ছা বিয়াই সাহেব, আপনার কাছে খুচরা টাকা আছে নাকি?'

জালাল সাহেব দ্রুত নিজের পকেটে হাত দিয়ে বললেন, 'আমিই টাকা দিচ্ছি, আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না।'

মফিজ সাহেব জালাল সাহেবের হাতটা আবার ধরে বেশ জোরে চাপ দিয়ে বলেন, 'কী দরকার ছিল!'

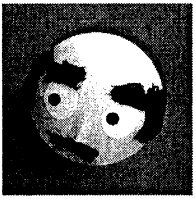

মাটির ব্যাংকটা মামার সামনে এনে সেলিম হাসতে হাসতে বলল, 'বাবা তো বিয়েতে রাজি, টাকা যা খরচ করার বাবাই করবেন। মামা, চলো না, ব্যাংকটা ভেঙে দেখি এ পর্যন্ত আমরা কত টাকা জমাতে পারলাম।'

'ওকে।' মামা পায়ের ওপর পা তুলে মেঝেতেই বসে পড়েন।

'তার আগে চলো না, আমাদের এই সাফল্যে আমরা একটু নাচি।'

'গুড আইডিয়া।'

সেলিম টেপ রেকর্ডারে একটা ক্যাসেট ভরে চাপ দেয় প্লে বাটনে। ধামধাম করে বেজে ওঠে একটা ইংরেজি গানের সুর। মামা লাফিয়ে উঠে নাচতে শুরু করতেই নিজের এক পায়ের সঙ্গে আরেক পা বাঁধিয়ে পড়ে যান নিজে নিজেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে বলেন, 'রাখ তো এসব!'

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করেই সেলিম বলে, 'মামা, বহু কষ্টে রোজগার করা টাকাতে বোঝাই করেছি এই ব্যাংকটা, এই ব্যাংক তুমি ভাঙবে, আমি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটা ডায়েরিতে লিখে রাখব।'

'ওকে, আমি রেডি।'

সেলিম একটা ডায়েরি আর কলম হাতে লিখতে বসে। কিছুক্ষণ ভেবে সে লেখা শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়তে থাকে সে লেখাগুলো—'রাত ৯টা বেজে ৫৫, ১৩ জানুয়ারি রোজ সোমবার, পূর্ব সোবহানবাগের বাড়িতে মামার হাতে একটা মাটির ব্যাংক, যার ভেতর আমাদের অনেক দিনের শ্রম। মামা আজ সে ব্যাংকটা ভাঙবেন। মামা ব্যাংকটা আস্তে আস্তে ওপরে তুলছেন, হ্যাঁ ওপরের তুলছেন, হ্যাঁ... হ্যাঁ..., এবার হাত থেকে ছেড়ে দিচ্ছেন মামা ব্যাংকটা। ব্যাংক নিচে পড়ছে..., পড়ছে..., হঠাৎ ড্রুম!'

সেলিম লিখেই চলছে মনোযোগ দিয়ে আর মামা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন ভাঙা ব্যাংকটার দিকে।

'মামা, গুনেছ কত টাকা?'

'হ্যাঁ।'

'কত?'

'বারো...।

'হ্যাঁ বারো, বলো বলো...?'

'বারো...।'

সেলিম কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলে, ‘বারোশ?’

‘না।

‘বারো হাজার?’

‘না।’

‘বারো লাখ?’

কাঁদোস্বরে মামা বলেন, ‘না।’

‘তাহলে বারো কোটি?’

‘তাও না।’

‘তাহলে?’ সেলিম মামার দিকে ফিরে তাকায় আগ্রহ নিয়ে।

‘মাত্র বারো টাকা।’

অনেকক্ষণ চুপ থেকে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সেলিম বলে, ‘মামা, টাকাগুলো গায়েব করল কে?’

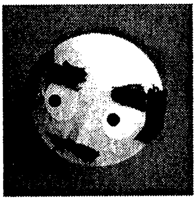

মফিজ সাহেব শ্যালককে ফিসফিস করে ডাকছেন আর বলছেন, 'একটা হিসাব করিয়া দিয়া যা না!'

সেলিমের বিয়েতে সারা দিন প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে মামার, তাই প্রায় অচেতন হয়ে ঘুমাচ্ছেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর মামা ঘুমের ঘোরেই বললেন, 'কে?'

শ্যালকের কানের আরো কাছাকাছি মুখ নিয়ে মফিজ সাহেব একটু শব্দ করে বললেন, 'আমি মফিজ।'

'কোন মফিজ?' ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে মামার গলা।

হাসি হাসি মুখ করে মফিজ সাহেব মামার পিঠে আদর করে একটা হাত রাখলেন, 'তোর দুলাভাই।'

'কোন দুলাভাই?' ঘুমিয়েই ঘুমিয়েই বললেন মামা।

'যে দুলাভাই তোকে বসাইয়া বসাইয়া খাওয়ায়।' রাগত স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন মফিজ সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে মামা প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন, 'দুলাভাই, এত রাতে?'

'ঘুম আসিতেছে না রে।' রাগের বদলে মুখটা কাচুমাচু হয়ে গেল মফিজ সাহেবের, 'চোখ থেকে ঘুম উধাও হইয়া গিয়াছে।'

'কেন?'

'একটা হিসাব করিতে হইবে রে।'

'কিসের হিসাব?'

শ্যালকের একটা হাত ধরে বিছানা থেকে টেনে তুললেন মফিজ সাহেব। হাতটা ধরেই তাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ড্রইংরুমে। তারপর সোফার ওপর পা দুটো তুলে তাকেও কাছে বসালেন, 'বিবাহে মোট কত খরচ হইল রে?'

বিশাল একটা হাই তুলতে তুলতে মামা বললেন, 'কাল সকালে বলি দুলাভাই? এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'সকালে বলিবি? ঘুম পাইতেছে তোর?' মফিজ সাহেব কাতরচোখে শ্যালকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার যে ঘুম হইবে না রে!'

বিরক্তচোখে মফিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকালেন মামা। একটা কাগজ বের করে সেই কাগজ দেখে হিসাব করতে লাগলেন। প্রায় তিন মিনিট পর তিনি বললেন, 'খরচ ভালোই হয়েছে!'

মফিজ সাহেব একটু ঝুঁকে এসে কান্নার স্বরে বললেন, 'কত?'

'মোট খরচ হয়েছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশ টাকা।'

'কী!' বাঁ পাশের বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন মফিজ সাহেব, 'এত টাকা!' বেশ জোরে একটা হেঁচকি দিয়ে বললেন, 'আমরা যে বিবাহে জিনিসগুলি পাইয়াছি, তাহার দাম কত হইবে?'

'আমি জানতাম আপনি তার দামও জিজ্ঞাসা করবেন, তাই সেগুলোর দামও হিসাব করে রেখেছি।' মামা কাগজটার দিকে আবার তাকালেন, 'সবকিছু মিলিয়ে ছিয়াশি হাজার দুইশ টাকা।'

'খরচ হইতে উহা বাদ দিলে কত হয়?'

মামা কাগজটা উল্টিয়ে বললেন, 'সেটাও হিসাব করে রেখেছি, এক লক্ষ দশ হাজার একশ টাকা।'

'বলিস কি!' মফিজ সাহেব প্রায় কেঁদে ফেললেন, 'ই...ই...ই... এত টাকা লস, আমি ফকির হইয়া গিয়াছি রে...!'

মামা মফিজ সাহেবের একটা হাত ধরে কিছুটা সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'একটা বুদ্ধি পেয়েছি দুলাভাই।'

কান্না কান্না মুখটা দ্রুত স্বাভাবিক করে ফেললেন মফিজ সাহেব, 'কী-ই-ই?'

'বউয়ের হাতে, কানে, গলায় তো অনেক সোনার গয়না দেখলাম।'

চোখ দুটো চকচক করে ওঠে মফিজ সাহেবের। পা দুটো আরো গুটিয়ে নিয়ে আয়েশ করে বসে বলেন, 'গয়নাগুলির দাম কত হইবে বলিতে পারিবি?'

মাথা এদিক-ওদিক করলেন মামা, 'তা তো জানি না দুলাভাই।'

'বউ বোধহয় জানে, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানার তো কথা।'

'চল, জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।'

মামা মুখ কুঁচকিয়ে বললেন, 'এই বাসর রাতে ডিস্টার্ব করা কি ঠিক হবে?'

মফিজ সাহেব তার চেয়েও বেশি কুঁচকিয়ে ফেললেন তার মুখটা, 'আরে ধ্যাত, কিসের বাসর রাত! আল্লার সব রাতই সমান, আসমানে চান্দ উঠে, তারাগুলি চাহিয়া থাকে, চল।'

শ্যালকের হাত ধরে টানতে টানতে সেলিমের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ান মফিজ সাহেব। তারপর কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে তাকে ইশারা করেন দরজায় টোকা দিতে। মামা মাথা নেড়ে 'না' করতেই মফিজ সাহেব নিজেই এগিয়ে আসেন। কিন্তু দরজায় টোকা দিতে গিয়েই হাতটা ফিরিয়ে আনেন, কিছুক্ষণ পর আবার এগিয়ে দেন, আবার ফিরিয়ে আনেন। শেষে একটু সাহসী হয়ে টোকাটা দিয়েই ফেলেন দরজায়। কিন্তু দরজা খোলে না কেউ। মফিজ সাহেব একটু উত্তেজিত হয়ে শ্যালকের দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে বলেন, 'কিরে, খুলিতেছে না কেন, মরিয়া গেল নাকি ওরা?'

'আবার টোকা দিন।' বলেই মামা একটু পিছিয়ে আসেন।

মফিজ সাহেব আবার টোকা দেন, এবারও কেউ খোলে না। অনেকক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে শেষে আগের চেয়ে অসহায় ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'খোলে না তো রে, খোলে না তো!'

'জোরে টোকা দিন।'

মফিজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে জোরে টোকা দিতে থাকেন এবং শব্দ করে ডাকতে থাকেন, 'বৌমা, বৌমা...।'

কয়েক সেকেন্ড পরই দরজা খুলে মিতু এসে মফিজ সাহেবের সামনে দাঁড়ায়, 'বাবা, ডেকেছিলেন?'

'হ্যাঁ মা।' মফিজ সাহেব হঠাৎ ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলেন, 'কেমন আছ মা ?

'ভালো, বাবা।'

'ঘুম ভালো হইতেছে?'

কিছুটা লজ্জা পায় মিতু। ঘোমটা টেনে মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলে, 'কিছু বলবেন বাবা?'

'ও... ইয়ে..., মা, মা আমার, তোমার গায়ে যে সোনাদানা আছে, তাহা আসলই, না নকল?'

'এগুলো আসল বাবা, আমি নিজে পছন্দ করে কিনেছি?'

শ্যালকের দিকে তাকিয়ে মফিজ সাহেব ভেংচি কেটে বলেন, 'তোরে বলিয়াছিলাম না! তা মা, সবগুলির দাম কত, তা কি তুমি জানো?'

'জি বাবা, এক লক্ষ দশ হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা।'

শ্যালককে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে টাকার অঙ্কটা লিখতে বলেন মফিজ সাহেব, তারপর মিতুর দিকে তাকিয়ে গদগদ হাসিতে বলেন, 'তা মা, তুমি এখন ঘুমাও, এত রাতে ডিস্টার্ব করিবার জন্য আমি ভী..ষ..ণ লজ্জিত।'

প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে ড্রইংরুমে এসে মফিজ সাহেব শ্যালককে বললেন, 'দ্রুত হিসাবটা করিয়া ফেল দেখি!'

মামা কাগজে টাকার অঙ্ক দুটো লিখে দ্রুত হিসাব করে বলেন, 'দুলাভাই, গয়নাগাটির যে দাম, তা থেকে লসের টাকা বাদ দিলে পঞ্চাশ টাকা বেশি থাকে।

'মানে লাভ হইয়াছে, পুরো পঞ্চাশ টাকা লাভ হইয়াছে।' মফিজ সাহেব একটু লাফিয়ে উঠতে গিয়েই পাশে ছোট টেবিলটার ওপর রাখা কাচের জগটা পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব রকম করুণ চেহারা হয়ে যায় মফিজ সাহেবের। কাচগুলোর দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা কাচের টুকরো হাতে নেন তিনি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন হাতের কাচগুলোর দিকে। তারপর খুব বেদনার স্বরে শ্যালককে ডেকে বলেন, 'জগটা কাল কিনিয়া আনিয়াছিস, না?'

'জি দুলাভাই, পঞ্চান্ন টাকা দিয়ে কিনে এনেছিলাম।'

'এবার আরেকটা হিসাব কর তো—ভাঙ্গিয়া যাওয়া জগের পঞ্চান্ন টাকা হইতে লাভের পঞ্চাশ টাকা বাদ দিলে কত টাকা লস হয়?'

'পাঁচ টাকা দুলাভাই।'

'পাঁচ টাকা!' চমকে ওঠেন মফিজ সাহেব এবং শেষে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'জীবনের শেষ বয়সে এসে একটা লস করিয়া ফেলিলাম!'

ঘরে কখন যে মিতু এসেছে তা কেউই টের পায়নি। মফিজ সাহেবের কথাটা শুনেই সে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'না বাবা, কোনো লস হয়নি। জীবনের সবকিছুতে এত হিসাব করলে চলে বাবা?' মিতু আরো একটু এগিয়ে এসে মফিজ সাহেবের একটা হাত ধরে বলে, 'এই যে আমি এই বাড়িতে এলাম, আপনার সেবা করব প্রতিদিন, আপনার যখন খারাপ লাগবে তখন হাত বুলিয়ে দেব মাথায়, আপনি আমাকে প্রতিদিন বৌমা বৌমা বলে ডাকবেন, আমি সব কাজ ফেলে বাবা বাবা বলে ছুটে আসব আপনার কাছে, এই যে আমাদের এত আন্তরিকতা, এত প্রগাঢ় ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা—এগুলো কী লাভ নয় বাবা?'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবেন মফিজ সাহেব। তারপর মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেন, 'মিথ্যা কথা, না না... সত্যি কথা। আমি আসলেই একটা ইয়ে...।' নিজেই নিজের গালে খোঁচা দিয়ে মফিজ সাহেব বলেন, 'বৌমা, তুমি আমার পিঠে গুমুড় গুমুড় করিয়া কিল মারো তো, আমার একটু হুঁশ হউক, না না, কিল মারিতে তুমি লজ্জা পাইবে, তাহার চাইতে আমার গায়ে জোরে করিয়া একটা চিমটি দাও।'

মিতু মফিজ সাহেবের পায়ে সালাম করার জন্য হাত রাখতে যেতেই তিনি নিজের বুকে টেনে নেন মিতুকে, 'না না বৌমা, তুমি ওইখানে না, এইখানে আসো।' তারপর শ্যালকের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, 'দেখিয়াছিস, আমার চান্দের মতো বৌমা, আমার সারা জীবনের লাভ!'

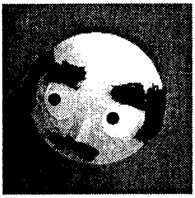

ছালেহা বেগম খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বললেন, 'আপনি কাঁদছেন কেন?'

মফিজ সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'এমনি।'

'আপনি তো এমনি কাঁদার মানুষ নন!' ছালেহা বেগম মফিজ সাহেবের একটা হাত চেপে ধরলেন, 'এত রাতে আপনি একা একা ছাদে, আমাকে একটু বলেও আসতে পারতেন। যদিও আপনি প্রায় রাতেই ছাদে এসে একা একা দাঁড়িয়ে থাকেন, তবুও হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে তখন আপনাকে পাশে না দেখলে বুকের ভেতরটা ছ্যাত করে ওঠে। আপনার কী হয়েছে, বলেন তো?'

'কিছু হয় নাই সেলিমের মা। আজ কেন যেন বারবার মা আর বাবার কথা মনে পড়িতেছে।'

'ভালো মানুষদের কথা মনে পড়া ভালো।'

'তুমি জানো...।' মফিজ সাহেব ছালেহা বেগমের হাতের ওপর চাপ দিয়ে বলেন, 'বাবা না প্রতিদিন নামাজ শেষে আমাদের জন্য দোয়া করিতেন আর কাঁদিতেন। খুবই সামান্য আয়ের একজন মানুষ ছিলেন তিনি, আমরা ভাই-বোনও ছিলাম অনেক, আমাদের কোনো শখ-আহ্লাদই পূরণ করিতে পারেন নাই তিনি, কিন্তু সারাক্ষণ আমাদের আগলাইয়া রাখিতেন বুকের ভেতর, আর বলিতেন, সৎ থাকিও, সৎ পথে চলিও, জীবনে তুমি সফল হইবেই।'

'আপনি তো আপনার বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।'

'কোনো কোনো দিন আমরা না খাইয়া থাকিতাম, বাবা সেইদিন আমাদের গোল করিয়া বসাইয়া কী যে মজার মজার গল্প বলিতেন! আমাদের ক্ষুধা যে তখন কোথায় চলিয়া যাইত! একদিন এমন গল্প শুনিতে শুনিতে আমার ছোট বোনটা বলিয়া উঠিল, তাহার পেটে ব্যথা করিতেছে। মা তো অস্থিরই হইয়া গেলেন, বাবা অস্থির হইলেন আরো বেশি। আমার ছোট বোনটার যে একটা অসুখ ছিল আমরা তাহা জানিতাম না, তাহাকে প্রতিদিন ভালো ভালো খাবার দিতে বলিয়াছিলেন ডাক্তার, কিন্তু...।' মফিজ সাহেব ডুকরে কেঁদে ওঠেন, 'সেই রাতেই বোনটা আমার মারা যায়, পরের দিন রাতে বাবা বিষ খাইয়া মারা যান একা একা।'

'এসব কথা তো আপনি আমাকে কোনো দিন বলেননি!'

'বলিতে ইচ্ছা করে নাই সেলিমের মা।' মফিজ সাহেব উদাস হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বাবা মারা যাওয়ার কয়েক দিন পর শোকে-দুঃখে মাও মারা গেলেন। তখন একেবারে সাগরে পড়িয়া গেলাম আমরা। মা-বাবাহারা মানুষদের আসলে কেহই

সাহায্য করিতে চায় না, কত দিন আমরা না খাইয়া দিনাতিপাত করিয়াছি!' মফিজ সাহেব ঝট করে ছালেহা বেগমের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি কাঁদিতেছ কেন?'

'আপনি এত কষ্ট করেছেন, কোনো দিন জানতে পারি নাই।'

মফিজ সাহেব একটু হেসে বলেন, 'তুমি জানিলে কী করিতে, বলো? ক্ষুধার জ্বালায় চোখে অন্ধকার দেখিয়া যখন সবকিছু ছাড়িয়া এই শহরে চলিয়া আসি, কেহই তখন সাহায্য করে নাই, এক প্লেট ভাত দেয় নাই, থাকিবার একটু জায়গা দেয় নাই, বহু কষ্ট করিয়া আজ আমি এইখানে। আমার কেবলই মনে হয়, জীবনে আমি যেমন কষ্ট করিয়াছি, কষ্ট পাইয়াছি, আমার ছেলে-মেয়ের যেন সে রকম কিছু না করিতে হয়, তাহারা যেন একটুও কষ্ট না পায়। তাই আমি একটু হিসাব করিয়া চলি। তাহারা এখন তাহাদের বয়সী ছেলে-মেয়েদের মতো ইচ্ছামতো চলিতে পারিতেছে না, মাঝে মাঝে তাই তাহারা রাগ করে, আমি এইগুলি বুঝি সেলিমের মা। আমি যা রাখিয়া যাইতেছি তাহাদের জন্য, আমার মৃত্যুর পর তাহারা হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাইতে পারিবে। সেলিমের মা...।' মফিজ সাহেব ছালেহা বেগমের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলেন, 'তুমি কি আমাকে এখনো কৃপণ বলিবা?'

'না।' ছালেহা বেগমের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ে।

'তুমি মাঝে মাঝে বলো না, আমি এইভাবে কথা বলি কেন? জীবনে লেখাপড়া তো তেমন করিতে পারি নাই, তাই এমন শুদ্ধ শুদ্ধ কথা বলিয়া একটু শিক্ষিত শিক্ষিত ভাব নিয়া মনে শান্তি পাই।' মফিজ সাহেব দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'আমরা আমাদের ছেলেকে আজ ধুমধামের সহিত বিবাহ দিলাম, আমাদের মেয়েকেও আমরা ধুমধামের সহিত বিবাহ দেব, তাহারা সুখে জীবন কাটাইবে, ইহাই তো আমাদের আসল সুখ।'

ছালেহা বেগম হঠাৎ মফিজ সাহেবের হাতটা বেশ জোরে চেপে ধরে লাজ লাজ ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলেন, 'সে জন্যই তো আপনাকে অনেক ভালোবাসি, সেটা কি আপনি জানেন?'

'জানি।' মফিজ সাহেব ছালেহা বেগমের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি ভাব আমি আরেকটা বিবাহ করিতে চাই, পাশের বাড়ির কাহারও সঙ্গে কথা বলি, মশকারা করি, এ সবই আমার অভিনয়। আমার কি এখন বিবাহের বয়স আছে, আর থাকিলেই কি তাহা করা উচিত হইবে? ছেলে-মেয়ে বড় হইয়াছে না! তোমাকে এইসব করিয়া খেপাইতে আমার বেশ মজা লাগে সেলিমের মা।'

'যান!' ছালেহা বেগম মফিজ সাহেবের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বেশ অভিমানী গলায় বলেন, 'আপনি বড় খারাপ মানুষ!'

মফিজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ছালেহা বেগমের হাতটা ধরে ফেলেন। তারপর তাকে কিছুটা জোর করে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে হাসতে হাসতে বলেন, 'এত দিনে বুঝিলা!'